আবার ঘনাদা

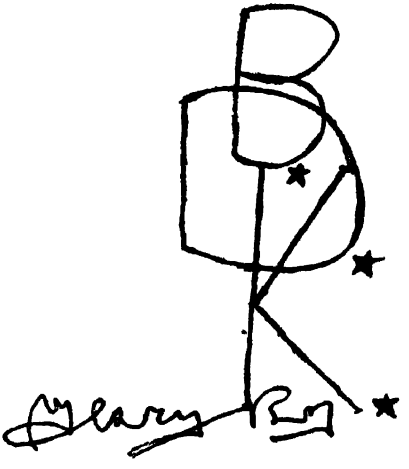

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম সংস্করণ :
৭ই ফেব্রুয়ারী,
১৯৬৩ সন

টা. ২.৫০
নঃ পঃ

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

পরমস্নেহাস্পদ

মনীষী ও কমলাকে—

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঢিল

ঘনাদা তাঁর তেতালার ঘর থেকে অকারণে কয়েকবার নিচের তলা পর্যন্ত নামাওঠা করেছেন, আমাদের আড্ডাঘরের সামনে ঘুরঘুর করেছেন খানিকক্ষণ, শুধু মান খুইয়ে ভেতরে ঢুকতে আর পারেন নি এ পর্যন্ত।

এখন হঠাৎ বাইরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর বাজখাঁই গলায় আমাদের বারো নম্বর বনমালা নস্কর লেনের নতুন চাকর বনোয়ারীকে তুলোধোনা বকুনি দিচ্ছেন শোনা গেল।

ঘনাদার কর্ণকুহরে জ্বালা ধরাবার জন্যেই যে উচ্চ হাসিটা ঘরে আমরা তুলেছিলাম সেটা থামিয়ে হঠাৎ ঘনাদার এ উত্তেজনা ও তম্বি-র হেতুটা বোঝবার চেষ্টা করলাম।

শিশির তার ঘর থেকে সিগারেটের টিন আনবার ছলে চট করে একবার ঘুরেও এল বারান্দা দিয়ে, ঘনাদার চোখের সামনে নতুন সিগারেটের টিন খোলাতেই যেন তন্ময় হয়ে।

ব্যাপার কি ?—আমরা মুচকি হাসির সঙ্গে উৎসুক।

ঢেলা।—শিশির সিগারেটের টিনটা মাঝখানের টেবিলে রেখে একটি সংক্ষিপ্ত কথাতেই রহস্য ঘনীভূত করে তুলল।

ঢেলা !—আমরা হতভম্ব।

আমাদের বনোয়ারী ঘনাদাকে ঢেলা মেরেছে !—শিবুর বিস্মিত শঙ্কিত অভিনয়ের ধরনে আমরা প্রয়োজনের চেয়ে বেশী জোরেই হেসে উঠলাম। কারণে অকারণে হেসে উঠে আমাদের জটলাটা জানান দেওয়াই অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য।

না হে না, ঢিল মারার চেয়ে বেশী অন্যায় করেছে।—শিশির এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে,—ঘনাদার ঘরে একটা ভাঙা কাঁচের পেপারওয়েট

পড়ে থাকে দেখেছ তো। বনোয়ারী ভাঙা কাঁচের ঢেলা ভেবে ঝাঁট দেবার সময় সেটি কোথায় নাকি ফেলে দিয়েছে!

এই ব্যাপার!

আরেক চোট আমাদের হাসির হর্‌রা উঠল। ব্যাপার যাই হোক আমাদের মতলব যে হাসিল হয়েছে সামান্য একটা ভাঙা কাঁচের ঢেলা নিয়ে ঘনাদার হৈ চৈ বাধানোতেই তা বোঝা গেল।

ঘনাদার এখন একবার-ডাকিলেই-যাইব গোছের অবস্থা।

কিন্তু সেই ডাকটি আর আমরা দিচ্ছি না। আমাদের ক'দিন যা জ্বালিয়েছেন তার একটু শোধ নিতেই হবে।

কি বিশ্রী কটা দিনই গেছে আমাদের। আমাদের কেন, শহরসুদ্ধ সবার। করপোরেশনের কল্যাণে একটু বর্ষণেই আমাদের মেস-বাড়িটি একেবারে দ্বীপ হয়ে যায় বলে আমাদের দুরবস্থা একটু বেশী।

এদিকে আকাশ যেন ফুটো হয়ে দিনের পর দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে সমস্ত শহর থৈ থৈ; ওদিকে দেশজোড়া ধর্মঘট। মেস থেকে নড়বার উপায় নেই কিন্তু মেসে সারাক্ষণ ভাজবার মত ভেরেণ্ডাও কই ছাই!

তাসপাশায় অরুচি ধরে গেছে, ক্যারম পিটে পিটে আঙুল টনটন। সময় যেন আর কাটে না।

ঘনাদা একটু কৃপা করলেই এ বন্দীদশা শাপে বর হয়ে ওঠে, কিন্তু তিনি মুখে একেবারে যেন ডবল তালা লাগিয়েছেন পাছে কিছু বেরিয়ে যায় এই ভয়ে।

বড়জোর একটু হুঁ কি অ্যাঁ, হাঁ কি না। তার বেশী শব্দজ্ঞানই যেন তাঁর হয় নি।

সাধ্যসাধনার ত্রুটি আমরা করি নি, ঘুষ দিয়েছি দরাজ হাতে,—কিন্তু কিছুতেই ভবী ভোলবার নয়।

লোভ আমরা কম দেখাই নি, বাকি রাখি নি যত রকম সম্ভব উস্কানি দিতে।

বিকেল বেলা ঘনাদার ঘর খোলা দেখে এক এক করে গিয়ে ঢুকেছি। ঘনাদা আপত্তি অবশ্য করেন নি, কিন্তু এমনভাবে দরজার ভেতর দিয়ে বাইরের ছাদের বৃষ্টি পড়া মনোযোগ দিয়ে দেখেছেন যেন আমরা মশা মাছির মত অবাঞ্ছিত হলেও সইতে বাধ্য হওয়া উপদ্রব মাত্র।

শিশির তবু সিগারেটের টিনটা খুলে ধরেছে, এবং ঘনাদা অন্যমনস্কভাবে তা থেকে সিগারেট তুলে নেওয়ার পর উৎসাহিত হয়ে লাইটার জ্বেলে ধরিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেছে,—এ রকম নাগাড়ে বৃষ্টি কলকাতায় আগে হত না, না ঘনাদা?

হুঁ,—ঘনাদা সিগারেটে টান দিয়ে শব্দটুকু যেন নাকের ভেতর থেকে ধোঁয়ার সঙ্গে ছেড়েছেন।

এসব অ্যাটম বোমা থেকে হচ্ছে, বুঝছিস না?—গৌর উস্কে দিতে চেয়েছে,—দুনিয়ার আবহাওয়া সব বদলে যাবে দেখিস, বাংলা দেশে বরফ পড়বে আর অ্যালাস্কায় চলবে লু!

ঘনাদা একবার শুধু গৌরের দিকে চেয়েছেন মাত্র, কিন্তু সলতে ধরে নি।

শিবু আর-এক মাত্রা চড়িয়েছে এবার,—তাই যদি হয় তো নতুন কি এমন? এই পৃথিবী একবার সত্যি উল্টে গেছল জানিস। সাইবিরিয়ার তখন এ হাল নয়। গাছপালা সবুজ ঘাস সবই ছিল। তারপর এক নিমিষে সেই সাইবিরিয়া একেবারে জমে বরফ।

শিশির সায় দিয়ে বলেছে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই তো। সাইবিরিয়ায় তুষারে ঢাকা তেপান্তরে যে-সব মরা ম্যামথ পাওয়া গেছে তাই থেকেই বোঝা যায় চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে ব্যাপারটা ঘটেছিল। ম্যামথের লাশগুলো পাওয়া গেছে একদম নিখুঁত তাজা। একটা লোম পর্যন্ত নষ্ট হয় নি। তাদের পেটে যে ঘাস পাওয়া গেছে তা গরম দেশে ছাড়া হয়ই না। হঠাৎ পৃথিবী উল্টে না গেলে ওরকম গোটা টাটকা ওসব লাশ থাকত না।

আমরা সবাই আড় চোখে ঘনাদার দিকে চেয়েছি।

কাকস্য পরিবেদনা।

ইতিমধ্যে আমাদের গোপন নির্দেশমাফিক ঠাকুর তেলমাখা ডালমুট মেশানো মুড়ির কাঁসি আর বনোয়ারী চায়ের ট্রে নিয়ে এসেছে।

ঘনাদা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মুড়ির কাঁসিতে হাত চালাতে ভোলেন নি, কিন্তু মুড়ি কড়াই চিবোনোর আওয়াজ ছাড়া মুখ দিয়ে তাঁর কিছু বার করা যায় নি।

হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হয়েছে। রাগও জমেছে মনে মনে।

ঘনাদার এ বেয়াড়াপনার কারণ যে বুঝি নি তা নয়, কিন্তু সে তো পান থেকে চুন খসার বেশী কিছু নয়। এত তোয়াজেও তার মাপ নেই!

বৃষ্টি দুদিন নাগাড়ে পড়বার পরই ঘনাদা বায়না ধরেছিলেন খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজার!

ঘনাদাকে খুশি করতে বৃষ্টির মধ্যে গৌরই গেছল বনোয়ারীকে নিয়ে বাজার করতে।

তারপর খেতে বসে খিচুড়ির সঙ্গে পাতে মাছভাজা পড়তেই ঘনাদা আইসেনহাওয়ারের দিকে ক্রুশ্চেফের মত ভুরু কুঁচকে গৌরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

গৌর শশব্যস্ত হয়ে কৈফিয়ত দিয়েছিল—ভালো ইলিশ পেলাম না ঘনাদা—তাই পার্শে নিয়ে এলাম। খেয়ে দেখুন, একেবারে আসল ক্যানিং-এর কুলীন পার্শে, ইলিশের মত হেঁজি-পেঁজির সঙ্গে এক জলে সাঁতরায় না পর্যন্ত—

ঘনাদার পাতে আস্ত যে ভাজা পার্শেটি পড়েছে, আমাদের সকলের পাতের লিলিপুটদের তুলনায় তা গালিভার। কিন্তু তাতে কি হয়! তখন আকাশের মেঘ ঘনাদার মুখে নেমেছে। ভাজা পার্শের সদ্ব্যবহার করতে করতে তিনি গম্ভীর মুখে যেন কাউকে উদ্দেশ না করে স্বগতোক্তি করেছেন,

—হুঁঃ, আমি আর কিছু বুঝি না! কাল [illegible]তেছে। আজ ইলিশ কখনো আসে!

বোঝানো-শোঝানো, খোশামোদ অনেক তারপর হয়েছে, ইলিশও এসেছে সেদিন রাত্রেই। কিন্তু ঘনাদাকে গলানো যায় নি। বৃষ্টির কটা দিন আমাদের মাঠে মারা গেছে।

অনেক চেষ্টাচরিত্র করেও কিছু ফল না পেয়ে শেষে আমাদেরও মেজাজ গেছে বিগড়ে। থাকুন ঘনাদা বোবা কালা হয়ে। ওঁকেও জব্দ না করে আমরা ছাড়ছি না।

সেই জব্দ করারই ফন্দিতে সেদিন তিনটে না বাজতেই আড্ডাঘরে আমরা সবাই জড়। শিবুর এক মামাত ভাই সম্প্রতি আফ্রিকায় ক-বছর চাকরি করে ফিরেছেন। সকালে তিনি এসেছিলেন শিবুর সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে পেয়েই বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। ভদ্রলোক রসিক। সব শুনে-টুনে আমাদের সঙ্গে জুটতে আপত্তি করেন নি। জীবনে কোন দিন বন্দুক না ধরলেও ভদ্রলোকের চেহারাটা জমকালো। আমাদের কথায় আধা মিলিটারি পোশাকে বিকেলে সেজে এসেছেন। আপাতত শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘনাদার মৌরসী আরামকেদারায় তাঁকে বসিয়েছি, আর আমরা মুগ্ধ শ্রোতা সেজে তাঁকে নিয়ে ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বাস উল্লাস বিস্ময় ও হর্ষধ্বনিতে যেন বাড়ি সরগরম করে তুলেছি।

দুপুরের দিবানিদ্রা সেরে ওঠবার পর যথারীতি গড়গড়ায় তাম্রকূট সেবন করতে করতে ঘনাদাও নির্ঘাত সে আওয়াজ মাঝে মাঝে পেয়ে কৌতূহলী হয়েছেন। ঠাকুর রামভুজের মারফত খবরটাও তাঁর কাছে পৌঁছে দিতে ভুল হয় নি। যেমন মহলা দিয়ে শেখানো ছিল, রামভুজ সেইভাবে একটু সকাল সকালই চা নিয়ে গেছে এবং ঘনাদার প্রশ্নের অপেক্ষায় না থেকে নিজে থেকেই নালিশ জানিয়ে বলেছে,—তিন বাজতে না বাজতে চা। বোলেন ত বড়বাবু হামাদের কেতো মুশকিল!

ঘনাদা নিচের গোলমাল সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার সুযোগ পেয়েছেন আর রামভুজ তার হিন্দি-বাংলার খিচুড়িতে যতখানি সম্ভব বিস্ময় ঢেলে দিয়ে বলেছে—আরে বাস রে। বহুৎ বড়া এক শিকারী আসিয়েছে সমুন্দরকে পারসে! কেত্‌না শের গণ্ডার হাঁথী মারিয়েছে। বাবুলোগ সব ওহি কিস্‌সা শুনতে আছে!

আর ঘনাদা স্থির থাকতে পারেন!

তারপর রামভুজও চা দিয়ে নিচে নেমেছে, আর তার প্রায় পিছু পিছুই ঘনাদা।

আড্ডাঘরে একবার এসে দাঁড়াবার জন্যে প্রাণটা তাঁর ছটফট করছে তখন, পারছেন না শুধু মানের দায়ে। ছটফটানিটাই বনোয়ারীর ওপর বকুনি হয়ে বেরিয়েছে, কিন্তু তাতেও যা ভেবেছিলেন তা হয় নি।

গল্প শুনতে আমরা এমন যেন মশগুল যে ঘনাদার ওই পাড়া-জাগানো চীৎকার কানেই যায় নি।

এতক্ষণ পর্যন্ত যাও বা রাশ টানা ছিল—বনোয়ারীর এক চেঙাড়ি বেগুনি ফুলুরি পাঁপরভাজা নিয়ে আড্ডাঘরে ঢোকার সঙ্গে তা ছিঁড়ে গেল।

বনোয়ারী টেবিলের ওপর চেঙাড়িটা রেখে বেরিয়ে যাবার আগেই, যেন ঘরে কেউ আছে কি নেই খেয়াল না করে টেবিল থেকে খবরের কাগজটা নিতেই ঘনাদা ঢুকে পড়লেন।

ঢুকে পড়েই দাঁড়ালেন থমকে তাঁরই মৌরসী পাট্টা আরামকেদারায় শিবুর আধা মিলিটারি পোশাক-পরা মামাত ভাইকে দেখে।

আমরা কিন্তু তখনো যেন গল্পেই মশগুল।

তারপর মিঃ রাহা,—গৌর চোখ বড় বড় করে ভয়ে বিস্ময়ে ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলে—বোমার ভেতর থেকে দুটো কিফারু তিনটে ফারু চারটে কিবোকো ছুটে আসছে আর আপনার হাতে স্রেফ একটা পাঙ্গা। কি করলেন আপনি তখন?

ঘাস কাটলেন !

এবার আর চমকে ফিরে ঘনাদাকে লক্ষ্য না করে উপায় নেই। আমাদের সকলের মুখেই হঠাৎ যেন অবাঞ্ছিত উপদ্রবে বিরক্তির ভান। কিন্তু তাতেও বিস্ময় যেন আর চাপা থাকছে না।

ঘনাদা আমাদের দিকে অনুকম্পাভরে তাকিয়ে জ্বালা-ধরানো ব্যঙ্গের সুরে বললেন,—ঘাস ছাড়া আর কি কাটবে ! কারণ আফ্রিকার সোহাইলি ভাষায় ঘাস কাটবার লম্বা ধারালো ছুরিকেই পাঙ্গা বলে। তা ছাড়া বোমা হল গ্রাম কি তাঁবু-টাবুর চার ধারে গাছপালার তৈরী কাঠের দেওয়াল। তার ভেতর মানুষ থাকে, জানোয়ার সেখান থেকে বেরোয় না। আর কিবোকো যদিও হিপোপোটেমাসের সোয়াহিলি নাম কিন্তু কিফারু আর ফারু—আলাদা জানোয়ার নয়, কিফারুকেই সংক্ষেপে বলে ফারু—মানে গণ্ডার।

আমরা ধাতস্থ হয়ে কিছু বলবার আগেই ঘনাদা রাহার দিকে আঙুল তুলে হাসিমুখে শাসানির ভঙ্গিতে বললেন,—বোকাদের নিয়ে তামাশা করার স্বভাব এখনো তাহলে তোমার শোধরায় নি কাসিম ? এদের কাছে আবার রাহা হয়েছ ? মনে আছে বোদরুম-এ আমার সেই ত্রেচান্দিরি-র কথা—

আমাদের সঙ্গে রাহারও তখন চোখ কপালে উঠেছে। প্রায় তোতলা হয়ে গিয়ে তিনি বলবার চেষ্টা করলেন,—দেখুন আমি·····কি বলে·····

বুঝেছি ! বুঝেছি।—ঘনাদা রাহাকে কথাটা আর শেষ করতে না দিয়ে বললেন,—সে-সব দিনের কথা মনে করালে লজ্জা পাও একটু। সেও ভালো। তবে তোমার আর বিশেষ কি দোষ। মনিবের হুকুম তামিল করেছ মাত্র। এখানেও আজ তারই হুকুমে এসেছ জানি। দাম যা চেয়েছিলাম তা নিয়েও এসেছ নিশ্চয়, কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, তোমার মনিব স্যাভেজকে বোলো গিয়ে সে জিনিস আর তাকে দিতে পারলাম না।

যার জন্যে স্যাভেজ প্রাণটা বাদে সব কিছু দিতে প্রস্তুত, সে জিনিস আর আমার কাছে নেই !

ঘনাদার নাক থেকে ফোঁস করে একটা স্টীম ইঞ্জিনের মত আওয়াজ বার হ'ল। তাঁর বোধহয় ধারণা তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

আমরা তখনও অবশ্য হাঁ হয়ে আছি। রাহাই আমতা আমতা করে বললেন,—আমার নাম কিন্তু, ওই কি বললেন কাসিম নয়, আমি হলাম শিবুর মামাত ভাই। অনিল রাহা।

কি ?—ঘনাদা যেন আকাশ থেকে পড়ে রাহার দিকে তাকালেন, তারপর ধীরে ধীরে ভুল ভেঙে গিয়ে লজ্জা পাবার ভঙ্গিতে বললেন,—ছি ছি, আমারই ভুল। আশ্চর্য কিন্তু চেহারার মিল ! যাক, তবু ভালো, স্যাভেজের কাছে কথার খেলাপটা আপাতত হ'ল না। দেখি এখনো সেটা খুঁজে পাই কিনা !

ঘনাদা দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

বলা বাহুল্য এবার আমাদেরই উঠে গিয়ে ধরে আনতে হ'ল।

শিবুর চোখের ইশারায় রাহা তখন আরামকেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সেই আরামকেদারায় ঘনাদাকে প্রায় পাঁজাকোলা করে নামিয়ে দিয়ে যে যেখানে পারি বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি খুঁজতে চান ঘনাদা ?

ওই তোমাদের মূর্তিমান বনোয়ারী যা ফেলে দিয়েছে !—ঘনাদার রাগটা যেন সঙ্গে সঙ্গে চেঙাড়ির বেগুনি ফুলুরির ওপরই গিয়ে পড়ল ! শিশিরের এগিয়ে দেওয়া সিগারেটটা অগ্রাহ্য করে সেগুলো সাবাড় করবার জন্যে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

বনোয়ারী ফেলে দিয়েছে ? সেটা তো একটা ভাঙা কাঁচের পেপারওয়েট ! —আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছল।

ভাঙা কাঁচের পেপারওয়েট !—প্রায় অর্ধেক চেঙাড়ি শেষ করে মিনিট

দশেক বাদে ঘনাদা আমার দিকে কটমটিয়ে তাকালেন,—জানো ওটা কি বস্তু ? জানো ওটা কোথা থেকে পাওয়া ?

রাস্তায় কোথাও পড়ে-টড়ে ছিল বোধ হয় !—শিবুর মন্তব্য।

কেউ বাজে জঞ্জাল বলে ফেলে-টেলে দিয়েছে !—শিশিরের ফোড়ন।

কিংবা কেউ হয়তো কাউকে ছুড়ে মেরেছে !—গৌরের গবেষণা।

হ্যাঁ, ছুড়ে মারা জিনিসই বলতে পারো !—ঘনাদার মুখে রাগের বদলে আমাদের ওপর অবজ্ঞা মেশানো অনুকম্পাই ফুটে উঠল,—ছুড়ে মারা একটা ঢিলই বটে। ওই ঢিলের কল্যাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস যদিও বদলে লেখা যেত। কিন্তু ঢিলটা কোথা থেকে এসেছে ভাবতে পারো ?

আর ঘনাদাকে জ্বালানো উচিত হবে না, তাই মুখে অক্ষমতা ফুটিয়ে আমরা বোকা সেজে রইলাম এবার।

ঘনাদাই নিজের জবাব নিজে দিলেন,—এ ঢিল এসেছে এক কোটি দু কোটি নয়, অন্তত দশ হাজার কোটি কোটি মাইল দূর থেকে !

মোটে !—শিবু যেন হতাশ।

আমাদের গলায় কিরকম সব শব্দ, যা হাসি চাপবার চেষ্টা বলে ভুল হ'তে পারে।

হ্যাঁ, তবে তার দশ-বিশ হাজার লক্ষগুণ দূর থেকেও হ'তে পারে।—ঘনাদা নির্বিকার ভাবে বলে চললেন, অঙ্কের শূন্যগুলো যেন কালির ফোঁটা মাত্র।

কিন্তু আমাদের সব চেয়ে দূর গ্রহ প্লুটোই তো সূর্য থেকে তিন শ' ষাট কোটি মাইলের বেশী দূর নয়।—গৌর বিদ্যে জাহির করলে দুদিন আগে কোথায় একটা প্রবন্ধে পড়েছিল বলে।

হ্যাঃ, প্লুটো !—ঘনাদা অবজ্ঞার নাসিকাধ্বনিতে প্লুটোকে নস্যাৎ করে বললেন,—আমাদের সৌরমণ্ডলের সূর্য যে ছায়াপথ অর্থাৎ নক্ষত্রপুঞ্জের একটা নগণ্য তারা মাত্র সেই ছায়াপথের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত কুড়ি হাজার

কোটি কোটি মাইল দূর। প্লুটো-টুটো নয়, এ ঢিল সেই ছায়াপথেরও বাইরে থেকে এসেছে।

আমাদের গলা দিয়ে কিছু বেরুবার আগেই প্রতিবাদটা যেন অনুমান করে ঘনাদা আবার বললেন,—না, উল্কা নয়, এ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, বৈজ্ঞানিকেরা এর নাম দিয়েছেন টেক্‌টাইট। উল্কার সঙ্গে এর অনেক তফাৎ। উল্কা আমাদের সৌরমণ্ডলের না হোক নিজেদের এই ছায়াপথেরই জিনিস। উল্কাপিণ্ডের ভেতর অন্য সব হাল্কা ধাতুর সঙ্গে লোহা নিকেল থাকবেই। কিন্তু টেকটাইটে লোহা নিকেল নেই। দেখতে তা রঙীন কাঁচের গোলগাল ডেলার মত। তার ভেতর এলুমিনিয়াম আর বেরিলিয়মের রেডিও-আইসোটোপও পাওয়া গেছে। টেক্‌টাইটের সব রহস্য এখনো জানা যায় নি কিন্তু পণ্ডিতদের ধারণা মহাশূন্যের এসব ঢিল আমাদের ছায়াপথের সীমানার বাইরে অন্য নক্ষত্রলোক থেকে সম্ভবত এসেছে।

এই টেকটাইট এতদিন আপনার কাছে ছিল! আর আপনি তা হেলায় অছেদ্দায় যেখানে সেখানে ফেলে রাখতেন?—শিশির অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

তোমাদের ওই ধনুর্ধর বনোয়ারী না আসা পর্যন্ত তাতে তো কোন ক্ষতি হয় নি। তোমাদের কাছে তো ওটা কাঁচের কাগজ-চাপা!—ঘনাদা টিটকিরি দিলেন।

যথাসম্ভব লজ্জিত হবার ভান করে বললাম,—কিন্তু এ কাঁচের ঢিল থুড়ি টেক্‌টাইট আপনি পেলেন কোথায়?

শিবুটাকে নিয়ে পারা যায় না। হঠাৎ দুম করে বলে বসল—মাথায় পড়েছিল বোধ হয়!

আহাম্মক কোথাকার!—আমরা সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম,—দশ হাজার কোটি কোটি মাইল, কি তার চেয়ে দূরের ঢিল মাথায় পড়লে কেউ বাঁচে! অবশ্য তোর মত নিরেট মাথা হলে কথা নেই।

ঘনাদার মুখের মেঘটা জমতে গিয়েই কেটে গেল। প্রসন্ন মুখে তিনি বললেন, না মাথায় ওটা পড়ে নি। কারুর মাথায় টেকটাইট কখনো পড়েছে বলে শোনা যায় নি। যদিও টেকটাইট নানা দেশে মাটির ওপরেই ছড়ানো পাওয়া যায়। উল্কাপিণ্ডের মত মাটিতে গেঁথে যায় না। হ্যাঁ, কোথায় পেয়েছিলাম জিজ্ঞেস করছ? ও টেকটাইট পেয়েছিলাম বোদ্‌রুম-এ।

ঘনাদা থামলেন।

তারপর আমাদের মুখগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন,—বোদ্‌রুম শহর কোথায় জানো না নিশ্চয়! বোদ্‌রুম-এর নাম না শুনে থাকো প্রাচীন হ্যালিকারনেসস-এর কথা আশা করি জানো। সেকালের সপ্তম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য। রাজা মৌসোলসের স্মৃতিস্তম্ভ ওইখানেই ছিল। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য জগতের প্রথম ঐতিহাসিক হেরোডেটাস-এর ওই হ'ল জন্মস্থান। সেকেন্দার শাহ এসিয়া জয় করতে যাওয়ার পথে হ্যালিকারনেসস ধ্বংস করে লুট করে যান। সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর পেট্রোনিয়ম বলে এক শহর গড়ে ওঠে। পেট্রোনিয়ম নামটাই তুর্কীদের মুখে বিকৃত হয়ে হয়েছে বোদ্‌রুম।

প্রাচীন ইতিহাস যাই হোক বোদ্‌রুম শহর এখন তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা নগণ্য বন্দর মাত্র। বড় জাহাজ নয়, ঈজিয়ান সাগরের তলা থেকে স্পঞ্জ তোলা যাদের কাজ তাদেরই 'ত্রেচান্দিরি' নৌকো সেখানে ভিড় করে থাকে।

স্পঞ্জ তোলার ব্যবসা করার নামে একটা 'ত্রেচান্দিরি' নৌকো ভাড়া নিয়ে তখন বোদ্‌রুমে থাকি। 'ত্রেচান্দিরি' নেহাত ছোট নৌকো। ঠিক লঞ্চও তাকে বলা যায় না। আমার নৌকোটি লম্বা মাত্র কুড়ি-বাইশ হাত, পালও আছে আবার একটা ঝড়ঝড়ে পুরনো ডিজেল মোটরও। এই দুইএর জোরেও ঘণ্টায় ছ'সাত মাইলের বেশী যায় না।

এসব নৌকোর অবশ্য জোরে যাবার দরকার নেই। জায়গা বুঝে ডুবুরী

নামিয়ে সমুদ্রের তলা থেকে স্পঞ্জ তোলাই হ'ল তার আসল কাজ। তার জন্যে চাই সত্যিকার ভালো ডুবুরী। বোদ্‌রুম-এর সেরা ডুবুরী আঙ্কা কাপ্‌কিন মানে কাপ্‌কিন খুড়ো আমার নৌকোয় কাজ করে। আমি নৌকো চালাই আর ডুবুরীর নিশ্বাসের নল ধরা থেকে অন্য ফাই-ফরমাশ খাটে স্যামি বলে এক নিগ্রো ছোকরা। বোদ্‌রুম আর কারাবাকুলা দ্বীপের মাঝে চুকা প্রণালী থেকে কুমালা অন্তরীপ ঘুরে সিমি দ্বীপ পর্যন্ত আমাদের ত্রেচান্দিরি ঘোরাফেরা করে। কিন্তু স্পঞ্জ তোলা আর হয় না।

মাস দুয়েক বিনা কাজে মাইনে নিয়ে কাপ্‌কিন খুড়োই একদিন বেঁকে দাঁড়াল। খুড়োর সঙ্গে এই দু মাসে আমার একটা সত্যিকার স্নেহের সম্পর্কই গড়ে উঠেছে। ত্রেচান্দিরি-র পাটাতনে বসে দুজনে কফি খাচ্ছি, হঠাৎ সে আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে কফির পেয়ালাটা উবুড় করে রেখে বললে, —তোমার পয়সা আর খাব না দাস। এই শেষ!

কেন, হ'ল কি খুড়ো?—হেসে বললাম,—আমার তো আর জাল জুয়াচুরির পয়সা নয়। আর তা ছাড়া তুমি তো নিজের রোজগারের পয়সায় খাচ্ছ!

নিজের রোজগারের পয়সা খাচ্ছি?—খুড়ো চটে উঠে বললে,—এই দু মাসে ক'বার ডুবুরীর পোশাক চড়িয়েছি বলো তো? জাত ব্যবসা শেষে ভুলিয়ে ছাড়বে দেখছি। স্পঞ্জ যদি নাই তোমার দরকার তাহলে আমাকে বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছ কেন?

হেসে বললাম,—মাইনে কি মিছিমিছি দিচ্ছি! স্পঞ্জ তোমায় দিয়ে তোলাব। তবে আমার তো যে-সে স্পঞ্জে চলবে না, আসল ইউস্পঞ্জিয়া অফিসিনালিস্ মলিসিমা চাই!

আমরা শুধু কেশে উঠলাম। কিন্তু রাহা নতুন লোক, জিজ্ঞাসা না করে পারলেন না,—কি বললেন?

সব চেয়ে দামী স্পঞ্জের বৈজ্ঞানিক নাম। ঘনাদা একটু হেসে বুঝিয়ে

দিলেন,—চলতি নাম অবশ্য সরেস তুর্কী পেয়ালা। ওরকম নরম মোলায়েম উঁচু দরের স্পঞ্জ আর হয় না। এক সের তুলতে পারলেই শ' খানেক টাকা।

যেন আমাদের প্রতিবাদের আশায় একটু থেমে ঘনাদা আবার বলতে শুরু করলেন,—কিন্তু যাই বলি কাপ্‌কিন খুড়োকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। খানিক চুপ করে থেকে সে গম্ভীর হয়ে বললে,—তোমার মতলব আমি বুঝেছি!

কি আমার মতলব?—আমি অবাক হবার ভান করলাম।

আচ্ছা তোমার মতলবই হাসিল করব।—বলে খুড়ো সেই যে চুপ করল আর তার কাছে কোন কথা বার করতে পারলাম না।

সত্যি করে মুখ সে খুলল প্রায় দু হপ্তা বাদে। বোদ্‌রুম থেকে বেরিয়ে কুমালী অন্তরীপ ঘুরে সিমি দ্বীপের উত্তর দিয়ে তখন মার্মারিস উপসাগরের ভেতর ঢুকে এক সন্ধ্যায় আমরা নোঙর ফেলেছি।

এতদিন সাধারণ দরকারী আলাপ ছাড়া দুজনের মধ্যে এই অজানা পাড়ির ব্যাপারে কোন কথাই হয় নি। এবারের যাত্রার আয়োজন খুড়ো কাপ্‌কিন একাই সব করেছে আমায় চুপ করে শুধু দেখতে বলে। আমাদের ত্রেচান্দিরিতে এবার মাসখানেকের রসদ তো আছেই, তা ছাড়া আছে ডুবুরীর পোশাকের বদলে দুজনের অ্যাকোয়া-লাংস বা জল-ফুসফুস। কাঁচের মুখোশ সুদ্ধ এই অ্যাকোয়া-লাংসের হাওয়ার থলি পিঠে বেঁধে আর পায়ে ফ্লিপার বা পা-ডানা পরে সমুদ্রের তলায় মাছের মতই চরে বেড়ানো যায়।

নোঙর যেখানে আমরা ফেলেছিলাম সে জায়গাটা একেবারে নির্জন। আমাদের বাঁ দিকে পাথুরে জনমানবহীন সমুদ্রতীর। উত্তরে সঙ্কীর্ণ উপসাগরের ওপারে সন্ধ্যার অন্ধকারে কয়েকটা ঝাপসা পাহাড় মিলিয়ে আসছে।

অন্ধকার আরো গাঢ় হবার পর পাটাতনে বসে তুর্কী হুঁকোয় তামাক খেতে খেতে খুড়ো প্রথম আমাদের এবারের পাড়ির আসল উদ্দেশ্যের কথা তুললে।

হেসে বললে,—এখানে কি আছে জানো তো ?

বোকা সেজে বললাম,—যে স্পঞ্জের জুড়ি নেই সেই সরেস তুর্কী পেয়ালা বোধ হয় !

হুঁ, তুর্কী পেয়ালাই বটে !—খুড়ো হেসে উঠে বললে,—আর চালাকিতে দরকার নেই। শোনো তাহলে, যে খবর আমার সঙ্গে কবরেই নিয়ে যাব ঠিক করেছিলাম তাই আজ তোমার কাছে বলছি। বলছি তোমার ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে বলে। আর তোমার চামড়া কালো বলে। এই খবর নেবার জন্যে টাকা যাদের কাছে খোলামকুচি সেরকম কত মার্কিন আমীর আমায় সোনায় মুড়ে দিতে চেয়েছে। বুড়ো হয়ে আসছি। ডুবুরীর কাজ করতে করতে একদিন হয়তো দম ফেটে কি পক্ষাঘাত হয়ে মরব। ওদের কাছে এ খবর বেচে সেই টাকায় শেষ বয়সটা পায়ের ওপর পা দিয়ে কাটাতে পারি। কিন্তু তবু ওদের এ খোঁজ আমি দিই নি, দেব না। চাঁদির জোরে ওরা ধরাকে সরা দেখছে, দুনিয়ার সব জিনিস ওরা যেন পয়সা দিলেই কিনতে পারে। এখানে এই সমুদ্রের তলায় যা আছে ওরা তা চায় শুধু নিজেদের বাড়িতে বড় জোর জাদুঘরে রেখে জাঁক দেখাবার জন্য। আমাকে দু বছর ধরে লোভ দেখিয়ে এমন কি শাসিয়ে যে অতিষ্ঠ করে মারছে তার এসব জিনিসের ওপর ভক্তিশ্রদ্ধাও নেই। সে শুধু মালিক হবার দেমাকেই দুনিয়ার সব কিছু দুর্লভ জিনিস কিনতে চায়। কানাঘুষায় আমার এ আবিষ্কারের কথা সে শুনেছে, কিন্তু রাজত্বের লোভ দেখিয়েও পেটের কথা বার করতে পারে নি।

খুড়োর কথা শুনতে শুনতে মাথায় যেন ঘোর লাগছিল। ধরা গলায় বললাম,—সত্যিই এমন দুর্লভ জিনিস এখানে আছে ?

আছে, আছে। সকালেই ডুব দিয়ে নিজের চোখে দেখতে পাবে। পাঁচ বছর আগে স্পঞ্জের খোঁজে এ অঞ্চলে এসে দৈবাৎ আমি আবিষ্কার করি। বোদ্‌রুম-এ ফিরে গিয়ে দু'চার জন ইয়ার-বন্ধুর কাছে আসল জায়গার হদিশ

না দিলেও একটু আধটু গল্প করেছিলাম। তাই থেকেই ওই সব শকুনগুলোর টনক নড়েছে। কিন্তু তারাও কল্পনা করতে পারে না কি ঐশ্বর্য এই নোনা জলের তলায় লুকনো আছে। আমি আধামুখ্খু ডুবুরী কিন্তু ডাঙার ওপর বেকুফ হ'লেও ডুব দিলেই আমি খলিফা। জলের তলার জিনিস আমি চিনি। তা ছাড়া দু বছর জার্মানীর এক মিউজিয়মের হয়ে ডুবুরীর কাজও করেছি। বোদ্‌রুম ছেড়ে যে জলপথ ধরে আমরা এলাম, হাজার হাজার বছর আগে রোড্‌স সাইপ্রাস রোম এমন কি মিশর থেকে এই ছিল সেদিনকার পালতোলা সদাগরী জাহাজের রাস্তা। এখানকার ডুবো পাহাড়ে লেগে কত জাহাজ তলিয়ে গেছে। সমুদ্রের তলায় সেসব জাহাজের সওদা ছড়ানো। সে যুগের আশ্চর্য সব জিনিস, কাঁসার, তামার, সোনার। তা ছাড়া অ্যাম্ফোরা যাকে বলে সেই দুদিকে হাতল দেওয়া অপরূপ কারু-কাজের গ্রীস ও রোমের মাটির পাত্র 'ত অঢেল। ইউরোপ আমেরিকা থেকে কত দল এসে ডুবুরী লাগিয়ে সেসব জিনিস খুঁজে নিয়ে গেছে, কিন্তু তারা যেসব ডুবো জাহাজের জিনিস পেয়েছে সেগুলো বড় জোর দু হাজার বছর আগেকার। কিন্তু এইখানে যা আছে তার বয়স কম পক্ষেও তিন হাজারের ওপর। শুধু পেতল কাঁসা সোনার জিনিস নয়, এখানে যে জাহাজ ডুবে ছিল তাতে ছিল কাঁসা আর এক রকম চুনা পাথরের অদ্ভুত কয়েকটা মূর্তি। সমুদ্রের তলায় এতদিন থেকেও সেগুলি একেবারে নষ্ট হয় নি। অন্য কিছু আমি ছুঁই নি, শুধু একটি ছোট বুড়ো আঙুল প্রমাণ মূর্তি কুড়িয়ে নিয়ে গেছলাম। ঘসে ধুয়ে পরিষ্কার করে সে মূর্তি একজনকে শুধু দেখাই। তিনি একজন ফরাসী পণ্ডিত। এক মিউজিয়ামের হয়ে এই সব ডুবো জাহাজের খোঁজেই এসেছিলেন। মূর্তি দেখে তাঁর চক্ষুস্থির। চমকে বলে উঠেছিলেন, আরে, এ তো ভারতবর্ষের জিনিস! মূর্তিতে খোদাই কটা অক্ষরের মত চিহ্ন দেখে কি একটা নামও যেন করেছিলেন। মনে পড়ছে না এখন।

উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—মহেঞ্জদরো? হারাপ্পা?

খুড়ো উৎসাহিত হয়ে বললে,—হাঁ হাঁ—ওই নাম। কি তাঁর আগ্রহ কোথায় পেয়েছি জানবার। ও জিনিস এদিকের সদাগরী জাহাজে পাওয়াই নাকি কল্পনার বাইরে। লোকটা ভালো, কিন্তু তবু তাকে বলি নি কিছু। ও দেশের কাউকে এ জিনিস আবিষ্কারের বাহাদুরি নিতে দেব কেন?

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—জায়গাটা তুমি ঠিক চিনেছ তো খুড়ো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, কিছু ভাবনা নেই। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে এক ডুবো পাহাড়ে লেগে জাহাজটা ডুবেছিল। ভাগ্যক্রমে তার অনেক জিনিস ডোবা পাহাড়ের একটা গুহা গোছের গহ্বরে গিয়ে পড়েছিল। সেখান থেকে তিন হাজার বছর ধরে যখন তারা খোয়া যায় নি, তিন প্রহর রাতেও……ওকি!

কথার মধ্যে খুড়ো হঠাৎ চীৎকার করে ওঠায় আমিও চমকে ফিরে তাকালাম। কিন্তু কোথায় কি? চারিদিক একেবারে অন্ধকারে লেপা।

কি, দেখলে কি খুড়ো?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

একটা আলো। ওই দূরের সমুদ্রের বাঁকটার কাছে যেন জ্বলেই নিভে গেল!

এখানে আলো কোথা থেকে আসবে? আর ভুলে কোন নৌকো কি জাহাজ যদি এসেও থাকে তার আলো জ্বলেই নিভে যাবে কেন? ও তোমার মনের ভুল।

তাই হবে। বলে খুড়ো সায় দিলে।

কিন্তু খুড়োর মনের ভুল যে নয় সাংঘাতিক ভাবে বুঝলাম তার পরের দিন ভোর না হতেই।

উত্তেজনায় প্রথম দিকটা ভালো করে ঘুমই হয় নি। মহেঞ্জদরোর মূর্তি বলতে তো ব্রোঞ্জ বা অ্যালাবাস্টারের তৈরি কোন দেবীমূর্তিই হবে। ফরাসী পণ্ডিত যদি অক্ষর দেখে মহেঞ্জদরোর বলে চিনে থাকেন তাহলে এ মূর্তিতে সেই মহেঞ্জদরোর মার্কামারা গড়ন নিশ্চয় আছে। এ মূর্তি এখানে পেলে তো

ইতিহাসই বদলে লিখতে হবে। ভারতের সিন্ধুনদের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে এদিকের যোগাযোগের এর চেয়ে স্পষ্ট প্রমাণ তো আর হ'তে পারে না! এই মূর্তি যদি সত্যি এখানে উদ্ধার করতে পারি তো আমায় পায় কে?

অর্ধেক রাত এই সব ভাবনায় কাটিয়ে শেষে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ভোরের দিকে খুড়োর ঠেলাঠেলিতে ধড়মড় করে জেগে উঠলাম।

সর্বনাশ হয়ে গেছে বেটা দাস!

কি সর্বনাশ খুড়ো!—চোখ রগড়ে তখন উঠে বসেছি।

আমাদের অ্যাকোয়া-লাংস দুটোই কে চুরি করে নিয়ে গেছে!

চুরি করে? এই জনমানবহীন জায়গায় আমাদের নৌকো থেকে? এ কি ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি!

ভুতুড়ে নয়। কাল আমি ভুল দেখি নি। দূরের সমুদ্রে একটা আলো কাল সত্যিই জ্বলেছিল। সে আলো জ্বলা আর আমাদের নৌকায় চুরির রহস্যের পেছনে কি আছে তাও আমি বুঝেছি। কিন্তু চলো। এখন ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

ফিরেই গেলাম তারপর।

হপ্তাখানেক বাদে বোদ্‌রুম-এর বন্দরে আমাদের ত্রেচান্দিরি ঠেকতে না ঠেকতেই খুড়ো লাফিয়ে পড়ল জেটির ওপরে।

এখুনি কোথায় যাচ্ছ খুড়ো?—অবাক হয়ে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম।

আঙুল তুলে খুড়ো যা দেখালো সেটা দূরের বড় জেটিতে বাঁধা একটা ঝক্‌ঝকে ছোটখাট শৌখীন জাহাজ।

আরে, ওটা তো বোদরুম শহরটাই যে প্রায় কিনে রেখেছে সেই স্যাভেজ সাহেবের 'কেচ্'—আমিও তখন নেমে খুড়োর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি।

খুড়ো আমার দিকে অদ্ভুত ভাবে খানিক চেয়ে থেকে বললে,—এখনো

তুমি কিছু বোঝ নি! ওই স্যাভেজ সাহেবের সঙ্গেই আমার বোঝাপড়া। লোভ দেখিয়ে ভয় দেখিয়ে যা পারে নি, স্যাভেজ শয়তানি করে সেই কাজ হাসিল করেছে এতদিনে। সেদিন ওই 'কেচ্'-এর আলোই এক মুহূর্তের জন্যে দেখেছিলাম। লুকিয়ে পিছু নিয়ে আসল জায়গাটা জেনে নিতে দূরে ও জাহাজের আলো নিভিয়ে অপেক্ষা করছিল। অসাবধানে একবার বুঝি কোন আলো হঠাৎ জ্বলে ওঠে। আমি আহাম্মক, তাই সাবধান হই নি। রাত্রের অন্ধকারে আমাদের ঘুমের সুযোগ নিয়ে কেউ সাঁতরে এসে আমাদের ত্রেচান্দিরিতে ওঠে। তারপর অ্যাকোয়া-লাংস দুটি চুরি করে আমাদের ঠুঁটো করে দিয়ে যায়। আমরা ওখান থেকে যতদিনে এসেছি তার মধ্যে ওখানকার সব কিছু নিশ্চয় লুট করেই ও জাহাজ ফিরেছে। আমাদের সাতদিনের রাস্তা ও 'কেচ্'-এর কাছে একদিনের ওয়াস্তা। না, আমায় বাধা দিও না। যত বড় বিদেশী আমীরই হোক তুরস্কের বুকে বসে এ শয়তানি করার শোধ আমি নেবই।

খুড়ো কাপকিন চলে গেল। চেহারা তার দশাসই পালোয়ানের মত হলেও সরল হাসি মাখানো মুখই এতদিন দেখেছি। কিন্তু আজ যেন সে সত্যি ক্ষ্যাপা দানব হয়ে উঠেছে।

সমস্ত সকাল খুড়োর জন্যে বৃথাই অপেক্ষা করলাম। দুপুর বেলা খবর এল হাসপাতাল থেকে। আঙ্কা কাপকিন নাকি জেটি থেকে পড়ে গিয়ে দারুণ জখম হয়েছে। এক্ষুনি আমার যাওয়া দরকার।

গিয়ে যা দেখলাম তাতে শরীরের সমস্ত রক্ত আগুন হয়ে উঠল। খুড়োর প্রায় সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ডেজ। আমার দিকে করুণ চোখে চেয়ে বললে,—পারলাম না বেটা দাস, পারলাম না! স্বয়ং যমকে যে ও পাহারায় রেখেছে কেমন করে জানব।

আচ্ছা, যমের চেহারাটাই একবার দেখে আসি বলে উঠে পড়লাম।

ওই অবস্থাতেই কাৎরে উঠে খুড়ো বললে,—না না, যেও না তুমি দাস।

সে যে কি ভয়ানক দৈত্য তুমি ভাবতে পারো না, তোমায় গুঁড়িয়ে পিষে ফেলবে।

কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেলাম।

সেখান থেকে সোজা জেটিতে স্যাভেজ সাহেবের 'কেচ'-এ।

ক্রেনের মত শক্ত এক হাতেই আমার টুঁটিটা ধরে সে শূন্যে আমায় তুলে ফেললে।

জেটি থেকে জাহাজে পা দিতেই সামনের এক কেবিন থেকে একজন বেরিয়ে এসে অত্যন্ত অমায়িক ভাবে হেসে বললে,—আসুন, আসুন, জাহাজ দেখতে এসেছেন বুঝি? আপনার নামটা একটু জানতে পারি?

নামটা জানা কি বিশেষ দরকার?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—মিছরির মত মিষ্টিগলায় সে বললে,—কার পায়ের ধুলো এ জাহাজে পড়ল আমাদের একটু জানতে ইচ্ছে হয় বই কি!

বেশ সাধু ইচ্ছে। নামটা মুখস্থ করে নিন। দাস। ঘনশ্যাম দাস। আপনার নামটা তাহলে ?

অধীনের নাম কাসিম। বিনয়ে লোকটা যেন গলে যাবে। লোকটাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করলাম। তুর্কী না গ্রীক, মিশরী না সিরিয়ান কিছুই বোঝা যায় না। এমন কি বাঙালীও ভাবা যায়। অবিকল এই রাস্তার মত চেহারা।

নাম তো জেনেছেন, কড়া গলায় এবার বললাম, —এখন জাহাজটা একটু ঘুরে দেখতে পারি।

নিশ্চয় নিশ্চয়। শুধু ঘুরে দেখতেই চান বুঝি ?—বিনয়ের অবতার জিজ্ঞাসা করলে।

না শুধু ঘুরে দেখতে নয়, জাহাজের মালিক স্যাভেজ সাহেবের একটা পাওনাও মিটিয়ে দিতে। পাওনাটা আঙ্কা কাপকিনের হয়ে।

তাহলে সে পাওনা আমাকেই দিতে পারিস মর্কট !

বাজ পড়ার মত পিলে-চমকানো আওয়াজে পেছন ফিরে চেয়ে সত্যিই খুশি হলাম। একটা চেহারার মত চেহারা বটে। জমাট কালো লোহার তৈরি একটা বিরাট দৈত্য। পরনে খাটো প্যাণ্ট আর একটা সোয়েটার। শরীরের ইস্পাতের পেশীগুলো একটু ফোলালেই যেন সে সোয়েটার ফাটিয়ে দেবে।

সসম্ভ্রমে বললাম,—ও আপনাকেই ! কিন্তু খোদ স্যাভেজ সাহেবকে দিলেই ভালো হয় না ?

তাহলে তো স্যাভেজ সাহেবের নাগাল পাবার জন্যে তোকে তুলে ধরতে হয়।—ক্রেনের মত শক্ত এক হাতেই আমার টুঁটিটা ধরে সে শূন্যে আমায় তুলে ফেললে।

আরে করেন কি ! করেন কি ! ভয় পেয়ে যাচ্ছি যে !—কাতর ভাবে বললাম।

সোনা বাঁধানো দাঁত একটু ফাঁক করে শয়তানের মত হেসে সে আমায় ওপর থেকেই ছেড়ে দিয়ে বললে,—কি। শখ মিটেছে? স্যাভেজ সাহেবের নাগাল আর পেতে চাস?

তা চাই বই কি! আমি তার নাগাল না পেলে তাঁরই বা তাঁর হয়ে আপনারই আমার নাগাল পাওয়া দরকার

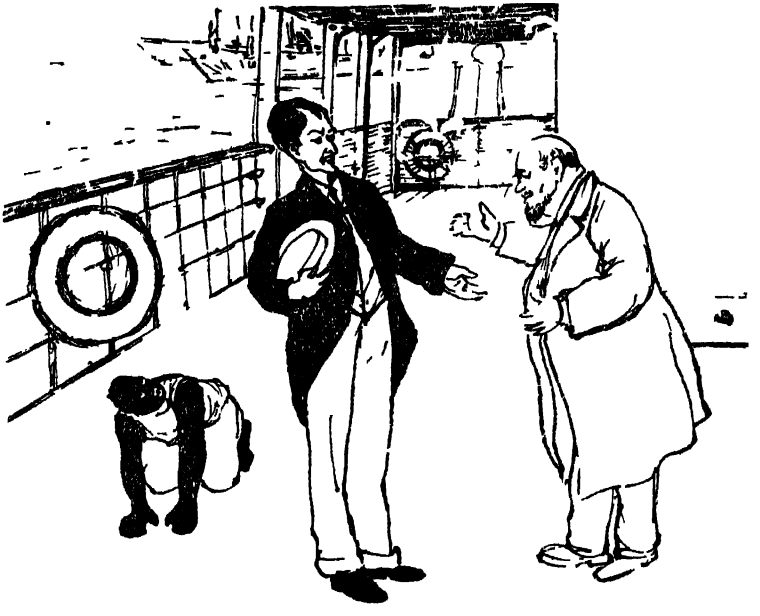

আমার দিকে চেয়ে হাসছেন, যেন কতকালের চেনা।

এক টানে ডেকের ওপর থুবড়ে পড়ার পর সেই সাক্ষাৎ যমের ভাঁটার মত চোখ দুটো যেন টাটার কারখানার 'ফারনেস্' হয়ে উঠল।

তবে রে নোংরা উকুন!—লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে কলের মুগুরের মত সে একটি ঘুষি চালাল।

জাহাজের রেলিংগুলো মজবুত। ভাঙল না, একটু বেঁকে গেল মাত্র। ধীরেসুস্থে গিয়ে তাকে তুলে ধরে বললাম,—লাগল নাকি আপনার? আহা, আমাদের আঙ্কা কাপকিনেরও লেগেছিল। তবে এটা বোধ হয় অত লাগবে না।

এবার তুলতে হল কেবিনের ভেতর থেকে। দরজাটা পল্কা, ভেঙে গেছে।

মাপ করবেন।—তুলে ধরে সবিনয়ে বললাম,—ভুলে ডান দিকে মেরে ফেলেছি। আঙ্কা কাপকিনের বাঁ চোয়ালটা ভেঙেছিল।

ডেকের ওপর থেকে আবার তাকে তুলে ধরেছি এমন সময় পেছন থেকে গলা-ছাড়া হাসির শব্দের সঙ্গে শুনতে পেলাম—আরে! আরে! করছেন কি? গুণ্ডাদের মত মারপিট করে কখনও আপনার মত লোক!

যমপুরুষকে ডেকের ওপরেই গড়িয়ে দিয়ে ফিরে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, স্বয়ং স্যাভেজই এসে হাজির হয়েছেন। নামে স্যাভেজ বটে কিন্তু চেহারায় যেন গোলগাল হাসিখুশি সদাশিব। আমার দিকে চেয়ে হাসছেন, যেন কত কালের চেনা।

আমিও হেসেই বললাম,—কি করব বলুন। গুণ্ডা পোষবার মত পয়সা তো নেই, তাই নিজেকেই কষ্ট করতে হয়।

আপনি যেন বড্ড রেগেছেন মনে হচ্ছে!—স্যাভেজ হেসে উঠলেন আবার।

হ্যাঁ, আমারও সেই রকম সন্দেহ হচ্ছে। তবে আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করলেই বোধহয় সব রাগ জল হয়ে যাবে।

তাহলে আর ভাবনা কি! আসুন আসুন, যত খুশি আলাপ করবেন। —স্যাভেজ আমাকে তাঁর খাস কেবিনের দিকে নিয়ে চললেন।

যেতে যেতে বললাম,—আপনার ওই পুষ্যিটিকে একটু হাসপাতালে পাঠালে হত না! আঙ্কা কাপকিনের পাশে একটা বেড বোধহয় খালি আছে এখনো!

স্যাভেজ হেসে উঠে বললেন,—যা বলেছেন। দুজনের পাশাপাশি থাকাই ভালো।

ততক্ষণে স্যাভেজের খাস কেবিনে আমরা পৌঁছে গেছি।

বসুন। বসুন। আলাপ করা যাক।—স্যাভেজ একটা সোফা আমায় দেখিয়ে দিলেন।

না, বসবার দরকার হবে না। আলাপও বেশী কিছু করবার নেই। শুধু মারমারিসের উপসাগরের ডোবা জাহাজ থেকে কি আনলেন একটু যদি জানান।

কি যে বলেন?—স্যাভেজের আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।—ওখানে ডোবা জাহাজ আছে নাকি? আর থাকলেও তাতে আছে কি!

যাই থাক্ আমার দরকার শুধু কয়েকটা ব্রোঞ্জ আর অ্যালাবাস্টারের মূর্তির। শুধু সেইগুলোর জন্যেই আপনাকে বিরক্ত করতে আসা।

বিলক্ষণ! বিরক্ত আবার কিসের! কিন্তু মূর্তি-টুর্তি আমি পাব কোথায়? আমার নানান জিনিস যোগাড় করবার বাতিক আছে বটে। কিন্তু এখানে তো শখ করে বেড়াতে এসেছি। এই যা দেখছেন তা ছাড়া কিছু এ জাহাজে নেই।

কেবিনের চারিদিকে সাজানো জিনিসগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে বললাম,—এ ছাড়া আর কিছুর কথা তাহলে আপনার মনে পড়ছে না? আপনার স্মরণশক্তিটা সত্যি দুর্বল দেখছি। একটা দাওয়াই দেওয়াই দরকার। আচ্ছা, এখান থেকে একটা কিছু যদি নিয়ে যাই কেমন হয়? যেটা নেই সেটার কথা ভাবতে ভাবতে যা আছে তার কথা মনে পড়ে যেতে পারে!

আপনার হেঁয়ালি বুঝলাম না। তবে নিন না আপনি যা খুশি!—স্যাভেজ উদার হয়ে উঠলেন।

পাশের টেবিলের ওপর কটা কাগজপত্র যা দিয়ে চাপা দেওয়া ছিল সেইটে তুলে নিয়ে বললাম,—এইটেই তাহলে নিই।

এক পলকের জন্যে স্যাভেজের মুখ ফ্যাকাসে মেরে গেল। তারপরেই হেসে উঠে তিনি বললেন,—আরে এত ভালো ভালো জিনিস থাকতে ওই একটা ভাঙা সস্তা পেপারওয়েট নিচ্ছেন।

সস্তা যদি হয় তো আপনার আপত্তি কিসের! এ তো আর যে জিনিস সংগ্রহ করবার জন্যে আপনি ফতুর হতে প্রস্তুত, আপনার চেয়ে যে জিনিসের দুর্লভ সংগ্রহ দুনিয়ার কারুর নেই সেই টেকটাইট নয়!—উঁহু ওদিকে ঘেঁষতে যাবেন না স্যাভেজ! কে জানে ওই ড্রয়ারে হয়তো একটা পিস্তল-টিস্তল থাকতে পারে। আপনার যেরকম মুখের চেহারা হয়েছে তাতে পিস্তল হাতে পেলে এই সামান্য পেপারওয়েটটার জন্যে আপনি হয়তো ছুড়েই বসবেন!

এক ধাপে টেবিলটার কাছে গিয়ে ড্রয়ারটা খুলে পিস্তলটা বার করে নিলাম। তারপর দরজা দিয়ে রেলিং ডিঙিয়ে সমুদ্রের জলে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললাম,—আমি গরিব চাষাড়ে মানুষ, টেকটাইটের আর কি জানি। নিজের দেশের বাড়িতেও রেখে আসতে সাহস না করে আপনি সঙ্গে সঙ্গে নিজের কাছে নিয়ে ফেরেন বলে এইটেই দুনিয়ার সব চেয়ে দুর্লভ টেকটাইট মনে করে নিয়ে চললাম। সেই মূর্তিগুলোর কথা যদি কখনো মনে পড়ে তাহলে আমার কাছে পৌঁছে দিলেই এ টেকটাইট থুড়ি পেপার-ওয়েট ফেরত পাবেন। আমার নামটা আপনার কাসিম জানে, ঠিকানাও একটা যাবার সময় দিয়ে যাচ্ছি।

সেই টেকটাইট নিয়েই চলে এসেছিলাম। আশা ছিল সুবুদ্ধি হয়ে স্যাভেজ একদিন সেই মূর্তিগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

ঘনাদা থামলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশিরের দীর্ঘ নিঃশ্বাস।

ওঃ, কি লোকসানটাই হল দুনিয়ার। এখন যদি স্যাভেজের সুবুদ্ধিও হয় টেকটাইট না পেলে সে কি আর সে মূর্তিগুলো ফেরত দেবে! ভারতের ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাটা আর জোড়া লাগবে না!

সব দোষ ওই বনোয়ারীর !

গৌরের আক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় মূর্তিমানের নাটকীয় আবির্ভাব।

হামি রাস্তাসে বহুত খুঁজে খুঁজে আনলাম হুজুর। ভালো কোরে ধোকে আনিয়েছি !—কাঁচুমাচু মুখে ভেতরে ঢুকে টেবিলের ওপর যে জিনিসটি বনোয়ারী রাখল তার দিকে চেয়ে আমরা একেবারে থ !

হুর্‌রে !—শিবু চেঁচিয়ে উঠল,—এই তো সেই সাত রাজার ধন এক মানিক ! ছায়াপথের ওপারের ঢিল ! ইতিহাসের হারানো খেই টেনে বার করবার চুম্বক !

এই ? এই আমার সেই টেকটাইট !—ঘৃণাভরে টেবিল থেকে কাঁচের ডেলাটা ফেলে দিয়ে শিশিরের সিগারেটের টিনটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে ঘনাদা গট গট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

পেপারওয়েট, থুড়ি, ঘনাদার টেকটাইট মেঝেয় পড়ে চুরমার।

ছুঁচ

আগুন! আগুন!

সত্যিকার আগুন নয়, ঘনাদাকে তাতাবার একটা ফিকির।

ফিকিরটা একেবারে মাঠে মারা যায় নি। ঘনাদা তাঁর সান্ধ্যভ্রমণ সেরে এসে আমাদের বসবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে এক পা চৌকাঠের এপারে চালিয়ে সভয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখের চেহারাটা দেখবার মত। প্রায় পিছু ফিরে ছুট মারেন আর কি!

শেষ পর্যন্ত আমাদের জমায়েত হয়ে বসার ধরনেই বোধহয় সাহস পেয়ে নিজেকে সামলে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘরে এসে ঢুকে তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় আগুন হে!

শিশির ঘনাদার মৌরসী আরামকেদারাটা সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—আজ্ঞে, বাজারের কথা বলছি।

আরামকেদারায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ঘনাদা মৃদু কৌতূহল প্রকাশ করলেন,—বাজারে আগুন লেগেছে নাকি?

আজ্ঞে, লেগেছে তো অনেক দিনই। ক্রমশই বাড়ছে যে!—শিবু উদ্বেগ দেখালে।

বাড়বে, আরো বাড়বে!—ঘনাদার নির্লিপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী।

কি বলছেন ঘনাদা! তাহলে তো সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখনই তো কোন জিনিস ছোঁবার জো নেই। আলু বারো আনা, বাঁধাকপি দেড় টাকা, মাংস চার টাকা, মাছ সাত টাকা।

আজই সকালের বাজারটা নিজের হাতে করতে হয়েছে বলে যতখানি রয় সয় বাড়িয়ে ফিরিস্তি দিলাম।

কিন্তু ঘনাদা তাতেও অবিচলিত। নিশ্চিন্ত ভাবে বললেন,—ও তো কিছুই নয়। কলির এই তো সবে সন্ধ্যে।

গৌরকে এবার উল্টো দিক থেকে আঁচ দিতে হল। ঘনাদাকেই সমর্থন করে আমাদের জ্ঞান বিতরণ করে বললে,—মানুষ কি রেটে বাড়ছে জানিস! পঞ্চাশ বছরে মানুষের ভারেই মেদিনী টলমল করবে। ডাঙার ফসলে তো কুলোবেই না, সমুদ্রে চাষ করেও কূল পাওয়া যাবে না। উপোস করে মরতে হবে।

গৌরের এ বক্তৃতায় কিছুটা বুঝি কাজ হল। তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে আর কারুর মাতব্বরি সহ্য করতে ঘনাদা একান্ত নারাজ। গৌর থামবার পর একটু নাসিকাধ্বনি করে বললেন,—উপোস করে মরতে হবে!

হবে না?—গৌর নিজের কথা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হল,—অত খাবার আসবে কোথা থেকে? সমুদ্রের জলের প্ল্যাঙ্কটন ছেঁকে খাবার তৈরির কারখানা বসিয়েও সে রাক্ষুসে দুনিয়ার ক্ষিদে মেটাতে পারবে কি? ছাদে ছাদে অ্যালজির চাষ করেও না।

বটে!—ঘনাদার টিটকিরির ধরনে আশান্বিত হয়ে উঠলাম।

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

পলতেটা ফুরফুর করে দুটো ফুলকি ছেড়েই ঠাণ্ডা। ধরল না।

তার বদলে শিশিরের কাছে চার হাজার আটশো অষ্টআশীতম সিগারেট ধার করে ঘনাদা শিশিরেরই দেশলাই দিয়ে ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন,—আচ্ছা উঠি।

সেকি! এখনই উঠবেন কি! এই তো এলেন!—আমরা শশব্যস্ত।

কিন্তু ঘনাদাকে ঠেকানো গেল না। সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে বললেন—না, একটু জরুরী কাজ রয়েছে।

ঘনাদার জরুরী কাজ! এই সান্ধ্যভ্রমণে ক্ষিদেটা শানিয়ে আসার পর!

আমরা কোন রকমে হাসি চাপলাম।

কিন্তু এত খেটে শেষে শক্ত অসুখে পড়বেন যে!—শিবু গভীর সহানুভূতি জানাল,—এক-আধ দিন একটু বিশ্রাম নিলে হয় না?

ঘনাদা জবাব না দিয়ে যেভাবে ভৎর্সনার দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেলেন, তাতে মনে হল যুরি গ্যাগারিন-কে ভোস্টকে চড়বার মুখে আমরা যেন পিছু ডেকেছি।

অতএব আবার মন্ত্রণা-সভা বসাতে হল।

ঘনাদাকে এবার চাগানো যায় কি করে?

গতিক এবার মোটেই সুবিধের নয়। সমস্যাটাই গোলমেলে।

রাগারাগি ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয় নি যে ঘনাদা জেদ করে গুম হয়ে আছেন। দিব্যি খাচ্ছেন দাচ্ছেন, ঘুরছেন ফিরছেন, আলাপ-সালাপ করছেন, কিন্তু আসল টোপটি গেলাতে গেলেই কেমন পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছেন। এ ক'দিন হেন চেষ্টা নেই যে করি নি, কিন্তু সবই পণ্ডশ্রম। আমাদের জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি যেন বারুদের বদলে ভিজে বালিতে পড়ে নিভে গিয়েছে।

এখন করা যায় কি!

তোয়াজ করা ছেড়ে চটিয়ে দিয়ে দেখা যাক!—শিবুর পরামর্শ।

আহা, চটাতেই তো গেলাম।—গৌরের হতাশা,—কিন্তু কাজ হল কই!

আরো কড়া দাওয়াই চাই।—আমার সিদ্ধান্ত।

আমার ধার দেওয়া সিগারেট সব ফেরত চাইব?—শিশিরের দ্বিধা।

না, তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে।—আমাদের আশঙ্কা।

তাহলে ধার বাড়িয়ে দি? একেবারে পাঁচ হাজার?—শিশিরের উৎসুক জিজ্ঞাসা।

মন্দ নয় মতলবটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটাও বাতিল করতে হল। প্যাঁচটা পুরোনো। দাঁত কেটে গেছে। ঠিক ধরবে না।

হঠাৎ গৌর বলে উঠল,—ঠিক হয়েছে, আর ভাবনা নেই।

কি ঠিক হয়েছে, কি ?—আমরা উৎসুক।

কানের জল কি করে বেরোয় ?—গৌর প্রশ্ন করে নিজেই জবাব দিলে—জল ঢেলে। তাই ভাঁওতা দিয়েই ভাঁওতা বার করতে হবে।

সেটা কি রকম ?

ভাঁওতাটা দেব কি ?

ভবী কি ভুলবে ?

আমাদের প্রত্যেকের নানারকম সন্দেহ।

চল, দেখাই যাক না।

আমাদের তেতালার সিঁড়ির নিচে দাঁড় করিয়ে রেখে গৌর ঘরের মধ্যে কি করতে গেল জানি না।

খানিকবাদে যখন বেরিয়ে এল, তখন হাতে তার একটা বাঁধানো খাতা।

আমাদের সরব ও নীরব কৌতূহল অগ্রাহ্য করে সে আগে-ভাগে সিঁড়ি দিয়ে বেশ একটু সশব্দেই ওপরে উঠল। আমরা তার পিছু পিছু।

তেতালায় ঘনাদার একানে একটি ঘর। সামনে ছোট একটু খোলা ছাদ।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখতে পেলাম ঘনাদা আমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা জামা আর হাতের ছুঁচসুতোটা তক্তপোশের তলাতেই সরিয়ে ফেলে চোখের চশমাটা খুলছেন।

তাঁকে এসব তুচ্ছ কাজ যে করতে হয়, ঘনাদা তা জানাতে চান না।

গৌরই এখন সর্দার। কি তার প্যাঁচ না জেনে শুধু তার মুখের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সকলে মিলে ভেতরে গিয়ে ঢুকলাম।

ব্যবস্থা সব করে ফেললাম ঘনাদা !—গৌর একেবারে মূর্তিমান উৎসাহ।

আমরাও চোখেমুখে যথাসাধ্য উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তুললাম দেখাদেখি।

হুঁ, করে ফেললে তাহলে !—ঘনাদা চশমাটা খাপে ভরতে ভরতে এমন ভাবে মন্তব্য করলেন যেন গৌর আর তাঁর মধ্যে এক ড্রয়ার ভর্তি চিঠিপত্র চালাচালি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। কমিটি মীটিং-টিটিং পার হয়ে

ব্যাপারটা বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন নিয়ে এবার শুধু আইনসভায় পাস হবার অপেক্ষায়।

আমরাই মাঝে থেকে ভ্যাবাচাকা। একবার গৌরের মুখের দিকে তাকাই, আর একবার ঘনাদার দিকে।

সাঙ্কেতিক গৌর-ঘনাদা সংবাদ আরো কিছুক্ষণ এমনি ভাবে চলল।

এ তো আর ফেলে রাখবার জিনিস নয়!—গৌর যদি বলে তো ঘনাদা তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলেন—ফেলে রাখলে চলবে কেন! সেরকম পরামর্শ কেউ দিচ্ছে বুঝি?

দিলেই বা শুনছে কে?—গৌরের মুখ থেকে খসতে না খসতে ঘনাদা বলেন,—না, উচিতই নয়। এ কি একটা ছেলেখেলা!

এর মধ্যে শিবুও আছে তা ভাবতেও পারি নি। সে হঠাৎ বলে উঠল,—একটু অসুবিধে অবশ্য হবে।

আমার একেবারে চক্ষুস্থির করে দিয়ে শিশির তাতে চটে উঠে বললে—হোক না অসুবিধে, তাতে আমরা পেছপাও নাকি! কাজের উদ্দেশ্যটা তা ভাবতে হবে!

উদ্দেশ্যটাই তো আসল। কমল হেরি ভ্রান্ত কেন কাঁটাবনে যেতে! না না, কাঁটা ঘেরি শান্ত কেন কমল, কমল…ওই মানে যা বলে আর কি!—আমার মুখ দিয়েও ফস করে কি ভাবে বেরিয়ে গেল দেখে আমিই অবাক।

মুখে মুখে পাক খেতে খেতে ব্যাপারটা যখন বেশ ঘোরালো ধোঁয়া হয়ে উঠেছে, গৌর তখন একটুখানি আলো ছাড়ল,—মাটি অবশ্য অনেকটা ফেলতে হবে।

ঘনাদার চোখদুটো একটু বড় হল কি? ও চোখ দেখে বোঝা কঠিন।

আমরা তখন যা হোক একটা জো পেয়ে গেছি। আর আমাদের পায় কে।

হ্যাঁ, বেশ ভালো মাটি,—বললে শিশির।

গঙ্গামাটিই ভালো।—শিবু সুপরামর্শ দিলে।

কতই বা আর খরচ! একটা ঠেলা বোঝাই করে আনলেই হবে—আমি ব্যবস্থাটাও করে ফেললাম।

গৌর আরেকটু আলোকপাতের জন্যেই বোধহয় উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে ছাদটার দিকে তাকিয়ে যেন মনে মনে মেপে ফেলে বললে,—ছোটখাট একটা বাগান হবে.—যাকে বলে, roof garden আর কি! তবে ফুল-টুল কিছু নয়, স্রেফ তরি-তরকারি। আলু-বেগুন-ঢ্যাড়স-ঝিঙে-পটল,—পটলই বা নয় কেন?

গৌর ঘনাদার দিকে চেয়ে তাঁকে সমর্থন জানাবার সুযোগ দিলে।

কিন্তু ঘনাদার মুখে কোন শব্দ নেই। শব্দ যদি বেরোয় তো মেঘের ডাকই শোনা যাবে মনে হয়। কারণ, ঘনাদা ছাড়া আর কারও মুখ হলে আষাঢ়ের মেঘের সঙ্গে তার মিলটা আরও স্পষ্ট বোঝা যেত।

ঘনাদা কিছু বলুন না বলুন, আমাদের থামলে চলে না। আমরা ধরতাই পেয়ে গেছি।

শিবুই ঘনাদার হয়ে জবাব দিলে,—পটল নয় বা কেন, কি বলছিস! আলবৎ পটল, একশোবার পটল। পাটনাই পটল। পটলই যদি না ফলাতে পারলাম তো ছাদের উপর বাগান করা কেন? চেষ্টায় কি না হয়।

শিবু দম নেবার জন্যে থামতেই আমি ধরে নিলাম,—নিশ্চয়! অ্যাব্রাহাম লিঙ্কলনের কথা মনে করো না! কুড়ুল দিয়ে সেই গাছ কাটার পর বাবা জিজ্ঞেস করতেই কি বলেছিল?

জুৎসই দৃষ্টান্তগুলো যথাসময়ে আমার কেমন করে ঠিক জুগিয়ে যায়।

শিশির শুধু একটু শুধরে দিলে,—লিঙ্কলন নয়, স্যার আইজ্যাক নিউটন।

বন্ধুবিচ্ছেদের সময় এটা নয়। আমি উদারভাবে মেনে নিয়ে বললাম,—

ওই একই কথা। আসল ব্যাপার হল এই যে, খাদ্য বাড়াতে হবে, যেমন করে পারো, যেখানে পারো।

গৌর দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে উঠল,—ঠিক বলেছ। Grow more food! পৃথিবীতে খাদ্যাভাব দিন দিন বাড়ছে, দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী করাল মুখব্যাদান করে ক্রমশ এগিয়ে আসছে সমস্ত মানবজাতির দিকে। এখন এতটুকু জমি ফেলে রাখলে চলবে না। ছাদ, ছাদই সই।

আর ঘনাদার ঘরের সামনেই যখন বাগান, তখন দেখাশোনা সম্বন্ধে তো ভাবতেই হবে না!—শিবু ছাদে তরি-তরকারির বাগানের স্বপক্ষে সব চেয়ে জোরালো যুক্তি দেখাল।

ঘনাদা তবু নীরব। চোখদুটোতেই শুধু একটু ঝিলিক যেন দিচ্ছে। এই ঝিলিক এখন না নেভে! গৌরকেই উদ্দেশ্য করে বললাম,—নার্সারীতে বীজ-টিজের অর্ডার দিয়েছিস তো?

তা আর দিই নি!—গৌর কর্তব্য সম্বন্ধে হুঁশিয়ারির প্রমাণ দিলে—শুধু বীজ কেন? সিন্ধি থেকে ফসফেট, ধাপা থেকে হাড়ের গুঁড়ো—সব আনছি।

ঘনাদা এখনও যদি ফেটে না পড়েন তাহলে তো নাচার।

এইজন্যই বুঝি ব্রহ্মাস্ত্রটি গৌর এতক্ষণ চেপে রেখেছিল। এইবার বাঁধানো খাতাটা ভক্তিভরে ঘনাদার সামনে খুলে ধরে বলল,—এখন এইটিতে শুধু একটা সই দিতে হবে ঘনাদা!

কেন?—সেফ্‌টি ভাল্‌ভ প্রায় ফাটিয়ে বয়লারের যেন স্টীম বেরুল।

এই আপনার সইটা সবার আগে থাকলে আবেদনটার দাম বাড়বে কিনা?—গৌর সগর্বে জানালে।

কিসের আবেদন? ছাদে ধান-ক্ষেত করার?

ঘনাদার বিদ্রূপটা গৌর গায়েই মাখলে না। বিনীত ভাবে বললে, —না, না, ছাদে চাষ তো হচ্ছেই, তার ওপরে আরো কিছু করা তো দরকার এই খাদ্য-সঙ্কটে। তাই আমরা সবাইকে একটা শপথ নেবার আবেদন

জানাচ্ছি। এই পড়ুন না। আন্তর্জাতিক আবেদন বলে 'এসপেরাণ্টো'তে লিখলাম।

বাঁধানো খাতায় প্রথম পাতাটাতেই হিজিবিজি একটা কি লেখা রয়েছে বটে, কিন্তু তার পাঠোদ্ধার করতে লিপিবিশারদ প্রত্নতাত্ত্বিকেরও ক্ষমতায় কুলোবে বলে মনে হয় না।

ঘনাদা একবার সেদিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, তুমিই পড়ো।

এসপেরাণ্টোটা বাংলায় অনুবাদ করেই পড়ো।—আমাদের কাতর অনুরোধ।

গৌর মূল এসপেরাণ্টো পড়তে না পারায় যেন বেশ ক্ষুণ্ণ হয়েই বাংলায় অনুবাদ করে যা শোনালে, তার মর্ম হল এই যে, পৃথিবীর অন্ন-সমস্যার আংশিক সমাধানের জন্যে আমাদের সকলকে এখন থেকেই স্বল্পাহারের শপথ নিতে হবে। আধ-পেটা যদি না পারি তো অন্তত সিকি ভাগ খাওয়া সকলে যেন ছাড়ে এই আবেদন।

আবেদনটা বুঝিয়ে দিয়েই গৌর সোৎসাহে জানালে, পরীক্ষাটা নিজেদের ওপরই শুরু করছি ঘনাদা! আজ থেকেই মেসের সিকি 'মেনু' ছেঁটে দিয়েছি। কাল সকাল থেকে ভাত ডাল আর স্রেফ একটি তরকারি। মাছ হতেও পারে, নাও হতে পারে। মাপেও সব কিছু কম। থালায় বাটিতে যা দেবার দিয়ে এক হাতা করে তুলে রাখা হবে। যাকে বলে বাধ্যতামূলক জাতীয় সঞ্চয়।

এই?—ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করলেন।

হ্যাঁ, আপাতত তো এই!—গৌর বেশ হতভম্ব। আমরা তো বটেই।

আপনি আরো কিছু ভেবেছেন নিশ্চয়!— শিবুর উস্কানির চেষ্টা।

আরো কিছু নয়, অন্য কিছু।—ঘনাদা সংক্ষিপ্ত।

মানে, গোড়াতেই আপনি অন্য কিছু বুঝেছিলেন?—আমাদের বিস্ময়।

হ্যাঁ, ভেবেছিলাম, পেটেন্টটা বুঝি নেওয়ার ব্যবস্থা করে এসেছ। আমার ছুঁচটা সত্যিই বুঝি ফাল হয়ে বেরিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

আপনার ছুঁচ!—শিশির তক্তপোশের তলা থেকে ছুঁচসুদ্ধু গুঁজে রাখা জামাটা তুলে ধরে ছুঁচটা বার করতে করতে বললে,—ফাল তো হয় নি। এখনও ছুঁচই আছে দেখছি।

ও ছুঁচ নয়। ছুঁচের মতই সরু ছোট কাঁচের পিপেট!—ঘনাদা আমাদের প্রতি করুণাকটাক্ষ করে বললেন,—একবার রক্তনদী বইয়ে যা সেইসঙ্গে একদিন জলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যা না থাকলে সূর্যদেবকে বধ করার অস্ত্র এ যুগে আর তৈরি করবার আশা মানুষকে ছাড়তে হত।

সূর্যদেব মানে, আমাদের এই সত্যিকার আকাশের সূর্য, আপনার সেই ছুঁচেই কাৎ!

এক রকম তাই বলতে পারো!—ঘনাদার বলার ধরনে বোঝা গেল কোনোরকম বড়াই তাঁর পছন্দ নয়।

শিশির ছুঁচটা রেখে দিয়ে সিগারেটের টিনটা তখন খুলে ফেলেছে

ঘনাদা সিগারেট তুলে নিয়ে ধরিয়ে গোটা দুই সুখটান দিয়ে খানিকক্ষণ চোখ দুটি বুজে চুপ করে রইলেন।

আমরা উদ্‌গ্রীব।

আমাদের বেশ কিছুক্ষণ আশা-নিরাশার দোলায় দুলিয়ে রেখে ঘনাদা অবশেষে চোখ মেলে তাকিয়ে ওপরের ছাদটাকেই সম্বোধন করে বললেন—তখন আমি কোথায়?

আমরাও তখন আর নেই।

ঘনাদার এরকম স্মৃতিভ্রংশ আমাদের কল্পনাতীত।

তাঁর স্মরণশক্তির মরা আঁচ যথাসাধ্য চাগিয়ে তোলার আশায় যে যেমন পারি কাঠকুটো এগিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম।

কলম্বিয়ায়?—আমার কুটো।

চুক্‌চিদের দেশে !—শিবুর প্যাঁকাটি।

নোভালা জেমলিয়া-য়—গৌরের ক'ফোঁটা কেরোসিন।

আমাদের এই মেসে !—শিশিরের এক আজলা জল একেবারে।

আমরা ক্ষেপে উঠে শিশিরকে নিয়ে পড়তে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তার দরকার হল না।

ঘনাদার চোখদুটোর সঙ্গে কানদুটোও বোধহয় ছাদেই ছিল। সেখান থেকে আমাদের দিকে কৃপা করে নামিয়ে বললেন,—হ্যাঁ, ইয়েমেন থেকে লালপানি পার হয়ে ইরিট্রিয়ার ওপর তখন ভাসছি। মার্কিন প্লেন, কিন্তু গাঢ় কমলা আর সবুজে ছোপানো গা, তাতে মান্ধাতার যুগের আমহারিক অক্ষরে সব কিছু লেখা।

আমার পাশের সীটের ভদ্রলোক নড়ে-চড়ে বসলেন। মনে হল সেই নড়া-চড়াতেই বুঝি প্লেনটাই টালমাটাল হয়ে গোঁত্তা মেরে পড়ে।

প্লেনের সীটগুলো নেহাৎ ছোটখাটো নয়। কিন্তু ভদ্রলোক একেবারে বৃত্রাসুরের বড় ভাই। দুটো সীট ভেঙে এক করে দিলে হয়তো তিনি একটু আরাম করে বসতে পারতেন। কিন্তু তার তো উপায় নেই। ইয়েমেন থেকেই পাশের সীটে এই পাঁচমণি লাশের মৃদুমন্দ ঠেলাঠুলি ধাক্কা খেতে খেতে আসছি। তিনিও স্বস্তিতে বসতে না পেরে উসখুস করছেন, সেই সঙ্গে আমিও।

ভদ্রলোক নীচের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন,—এই ইরিট্রিয়া নিয়েও ইতিহাসে এত মারামারি। দেশটার চেহারা দেখেছেন !

বললাম,—যা দেখেছেন তা ইরিট্রিয়া নয়।

ইরিট্রিয়া নয় !

সামনে পেছনে ও পাশে যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁরাও চমকে উঠলেন সে আওয়াজে। চমকাবার মতই আওয়াজ। ভদ্রলোকের গলাখানি তাঁর বপুর সঙ্গেই পাল্লা দেবার মত। সেই গলা তিনি আবার চটে উঠে ছেড়েছেন সপ্তমে।

আশেপাশের যাত্রীরা কেউ একটু মুচকে হেসে, কেউ বিরক্তির ভ্রুকুটি করে মুখ ফেরালেন।

আমি শান্তভাবে বললাম,—না, ইরিট্রিয়া ছাড়িয়ে ফরাসী সোমালি-ল্যাণ্ডের পাড় ছুঁয়ে আমরা এখন ইথিওপিয়ায় পৌঁছে গেছি।

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে যেভাবে তাকালেন, তাতে মনে হল, জানলা ভেঙে আমায় টুপ করে বাইরে ফেলে দেবেন, না, প্লেনের ভেতরেই হাড়গোড়-ভাঙা দ বানিয়ে দেবেন, ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত কি ভেবে বলা যায় না নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলেন গলাটা সপ্তম থেকে একটু নামিয়ে,—আপনি এসব জায়গা চেনেন? আগে এসেছেন কখনো?

তা, আসতে-টাসতে হয় মাঝে মাঝে।—একটু হেসে কবুল করলাম।

কেন?—বাজখাঁই গলার প্রশ্নে আবার প্লেনটা বুঝি কাঁপল।

তোজোকে একটু আদর করতে।

তোজোকে আদর করতে! কে সে?

হেসে তাঁর দিকে ফিরে গলা নামিয়ে সাবধান করার সুরে বললাম, যা বলে ফেলেছেন, ফেলেছেন। ইথিওপিয়ার বুকের ওপর তাদেরই প্লেনে বসে তোজো কে, এ প্রশ্ন আর করবেন না। আগেকার দিন হলে কোতল করতেও পারত।

কোতল করত? আমাকে!—ভদ্রলোকের ওই চেহারাই আরো ফুলে ফেঁপে জামার বোতামগুলো প্রায় ছেঁড়ে আর কি!

তাঁকে ঘাড় কাত করে আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে যেন সসম্ভ্রমে বললাম,—না, আপনাকে বোধহয় সাহস করত না।

ভদ্রলোক এবার একটু খুশি হলেন মনে হল। তাই আবার একটু টিপ্পুনি দিয়ে বললাম, তবে নেগুস্ নাগাস্তির কানে কথাটা না যাওয়াই ভালো।

নেগুস্ নাগাস্তি !—নামটা শুনেই ভদ্রলোকের গলায় আর যেন তেমন ঝাঁজ পাওয়া গেল না। একটু হতভম্ব হয়েই জিজ্ঞাসা করলেন,—নেগুস্ই তো জানি, নেগুস্ নাগাস্তি আবার কি ? তোজোর সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক ?

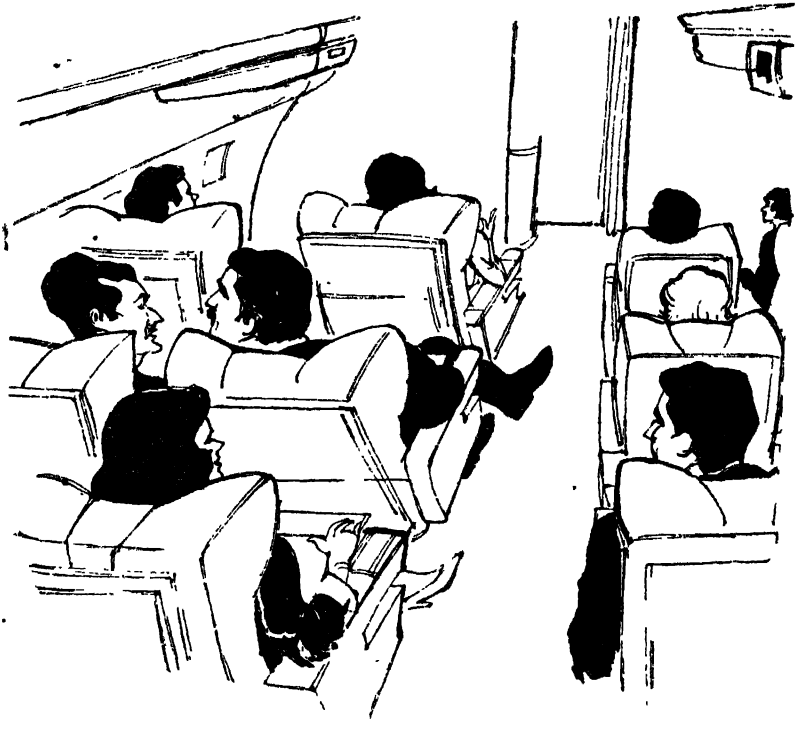

না, আপনাকে বোধহয় সাহস করত না।

নেগুস্ বলতে বোঝায় সম্রাট আর নেগুস্ নাগাস্তি মানে সম্রাটের সম্রাট, রাজচক্রবর্তী। তোজো হল তাঁরই পোষা চল্লিশটি সিংহের মধ্যে সবচেয়ে যেটি পেয়ারের, তার নাম। নেগুস্-এর প্রাসাদে সে ছাড়াই থাকে সারাক্ষণ।

ভদ্রলোক আমার দিকে খানিক চেয়ে থেকে কি ভাবলেন কে জানে। তারপর হঠাৎ পাশেই রাখা আমার হাতটা ধরে ফেলে করমর্দনের ছুতোয় হাড়গোড়গুলো কতখানি পলকা পরীক্ষা করতে করতে খুশিতে ডগমগ হয়ে বললেন,—আপনার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত সুখী হলাম। আপনার নামটা জানতে পারি ?

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে যেন প্রায় ককিয়ে ককিয়ে বললাম—অধীনের নাম দাস। এখন আপনার নামটা জানবার সৌভাগ্য এই গোলামের গোলামের হবে ?

কথাবার্তা আরবীতেই হচ্ছিল। এসব বিনয় সৌজন্য ও ভাষায় জমে ভালো।

ভদ্রলোক বাদশাহী চালেই বললেন,—শেখ ইব্‌ন ফরিদ।

ইব্‌ন ফরিদ!—নামটা শুনে আমি গদগদ হয়ে উঠলাম,—প্রায় সাড়ে সাতশো বছর আগে এক ইব্‌ন ফরিদ আরবকে ধন্য করেছিলেন। তাঁর কথা আর আপনাকে কি বলব। নিশ্চয় জানেন।

তা আর জানি না।—ইব্‌ন ফরিদ তাঁর আকর্ণবিস্তৃত গোঁফে চাড়া দিলেন।

আপনিও তো তাঁর মত টহলদার দেখছি। তিনি অবশ্য মস্ত বড় ভৌগোলিক ছিলেন। অপূর্ব ভ্রমণ-কাহিনী লিখে গেছেন। আপনি সেরকম লেখেন-টেখেন নাকি ?

আমার দিকে চেয়ে একবার চোখ মটকে হাসতে হাসতে ইব্‌ন ফরিদ বললেন,—এখনও লিখিনি। তবে লিখব। সময় হলেই লিখব। আপনি তো আড্ডিস আবাবাতেই থাকবেন ?

ইচ্ছে তো সেইরকম।—সবিনয়ে স্বীকার করলাম।

হ্যাঁ, নেগুস্‌-এর পোষা সিংহ নির্ভয়ে আদর করতে হলে ওখানেই থাকতে হয় আর বুনো সিংহ শিকার করতে হলে যেতে হয় অন্য কোথাও।—বলে

ইব্‌ন ফরিদ আমার পায়ের ওপর বিরিশি সিক্কার একটি আদরের থাপ্পড় দিয়ে প্লেন ফাটিয়ে হাসতে আরম্ভ করলেন।

আড্ডিস আবাবা শহরের সবচেয়ে যা আমার ভালো লাগে, তা সেখানকার গন্ধ। পৃথিবীর ছোট বড় আর কোন শহরের অমন অপরূপ গন্ধ আছে বলে জানি না। গন্ধটা পোড়া ইউক্যালিপ্টাস কাঠের। সমস্ত হাবসী জাতিদের যিনি এক রাজছত্রতলে মিলিয়েছিলেন, সেই নেগুস্ নাগাস্তি দ্বিতীয় মেনেলিক সর্বত্র ইউক্যালিপ্টাস গাছ পুঁতেছিলেন। সে গাছ এত বেড়েছে যে, লোকেরা ইউক্যালিপ্টাস জ্বালানি কাঠ হিসেবে পোড়ায়। শহরের হাওয়ায় তাই একটা মিষ্টি পরীদের গায়ের মত সুবাস সারাক্ষণ ভাসছে।

রাত্রে সে গন্ধটা আরো মন মাতানো। তারই নেশায় হোটেল থেকে বেরিয়ে শহরের একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম। হোটেলের ম্যানেজার বেরুবার সময় সাবধান করে দিয়েছিল যে, আড্ডিস আবাবার পথে-ঘাটে সারারাত হায়নারা চরে বেড়ায়। আশেপাশের পাহাড় থেকে তারা নেমে আসে, আবার ভোর হতে না হতে ফিরে যায়। জ্যান্ত মানুষকে সাধারণতঃ তারা এড়িয়ে চলে, তবে দুনিয়ায় অমন ছিঁচকে শয়তান জানোয়ার আর দুটি নেই। বেকায়দায় পেলে তারা সব করতে পারে। কোন রকমে জখম অসহায় অবস্থায় পেলে জ্যান্ত মানুষের মাংস তারা খুবলে খেতে পারে।

আড্ডিস আবাবার রাস্তাঘাট অত রাত্রে বেশ নির্জন পেয়েছিলাম। দিনের বেলায় গাধা ও ঘোড়ার সে নোংরা ভিড় আর নেই। এখানে সেখানে দু একটা হায়না দূর থেকে চোখে পড়েছে। দেখতে না দেখতে তারা ছায়ার মত মিলিয়ে গেছে কোথায়।

শহরের একদিকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এসে যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম, সেখান

থেকে একটি তেপান্তরের রাস্তা সুডানের খার্তুম হয়ে মরুভূমির দেশে ওয়াদি হাল্‌ফার দিকে গেছে। এই পথেই ইথিওপিয়ার রাজারা একদিন উত্তরের দিকে দিগ্বিজয়ে গিয়েছিলেন।

কিছুদূরে কোথায় একটা হায়নার হাসির শব্দে চমকে ফিরতেই এমন কিছু দেখলাম, যাতে শরীর-মন এক মুহূর্তে সজাগ হয়ে উঠল। একটা মোটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের গুঁড়ির পেছনে নিজেকে পাথরের মত নিস্তব্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হায়না কি জন্তু-জানোয়ার কিছু নয়, মানুষ। আর এই মানুষটিকে অন্ততঃ এত রাত্রে শহরের এই প্রান্তে দেখবার কথা সত্যি বলতে গেলে কল্পনাও করি নি।

মুখ দেখতে পাওয়ার দরকার নেই। আকার দেখেই মানুষটাকে চিনতে দেরি হয় না। আবিসিনিয়ার মানুষরা শক্ত সমর্থ জোয়ান হয় বটে, কিন্তু এমন একটা দৈত্যাকার মাংসের পাহাড় অন্ততঃ এ ক'দিনে আড্ডিস আবাবার রাস্তায় ঘাটে দরবারে কোথাও চোখে পড়েনি।

ইব্‌ন ফরিদই যে পালের গোদা একটা গণ্ডারের মত নির্জন রাস্তা দিয়ে শহরের বাইরে কোথাও হনহন করে' হেঁটে চলেছে, এ বিষয়ে তখন আর সন্দেহ নেই।

কিছুদূর সে এগিয়ে যাবার পর নিঃশব্দে তার পিছু নিলাম। খুব নিঃশব্দে নেবার দরকার ছিল না। কারণ, সে নিজেই পদভরে মেদিনী কাঁপিয়ে যেভাবে চলেছে, তাতে আর কোন শব্দ তার কানে যাবার কথা নয়।

কিন্তু ইব্‌ন ফরিদ সত্যি চলেছে কোথায়? শহর তো এইখানেই শেষ। তারপর তো প্রায় গাছপালাহীন পাথুরে ঢেউখেলানো তেপান্তর।

হঠাৎ মনে পড়ল দুদিন আগেই আড্ডিস আবাবার বাজারে যে শিকারীর সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার কথা। শখের শিকারী সে নয়। দুর্লভ দামী চামড়ার ব্যবসার খাতিরেই তার শিকার। বিশেষ করে কালোচিতার খোঁজেই

সে আবিসিনিয়ার এমন সব দুর্গম দূর জায়গায় দেশী অনুচরদের নিয়ে যায়, যা নেগুসের তহসিলদাররাও জানে কিনা সন্দেহ।

শহরের বাইরেই সম্প্রতি সে তাঁবু গেড়েছে জানি। লোকজন রসদ সংগ্রহ করে নতুন শিকারের 'সফরি'তে বেরুনই তার উদ্দেশ্য।

আমার অনুমানই ঠিক। কিছুদূর যেতেই শিকারীর সাদা তাঁবুটা অন্ধকারেই রাস্তার ধারে ঝাপসা ভাবে দেখা গেল। কাছে-পিঠে বাঁধা ঘোড়াগুলোরও পা ঠোকার শব্দ শোনা গেল সেই সঙ্গে সঙ্গে।

ইব্‌ন ফরিদের আসাটা যে অপ্রত্যাশিত নয়, শিকারীকে টর্চ হাতে তাঁবু থেকে কিছু দূরে অপেক্ষা করতে দেখেই তা বোঝা গেল।

শিকারীর হাতের টর্চটা একবার জ্বলে উঠতে ইব্‌ন ফরিদ হাঁক দিয়ে তার উপস্থিতি জানালে। আমি তখন পথের ধারে মাটির উপর শুয়ে পড়েছি।

ইব্‌ন ফরিদের চালচলনে সন্দেহ করবার মত সত্যিই অবশ্য তখনও কিছু নেই। হাঁক দিয়ে সাড়া দেওয়াটা অন্ততঃ লুকোচুরি কোন ব্যাপারের সঙ্গে খাপ খায় না।

কিন্তু গোপনীয় যদি কিছু না হয়, তাহলে এত রাত্রে এই শহরের বাইরে এসে দেখা করার মানে কি?

ইব্‌ন ফরিদের আড্ডিস আবাবায় এতদিন থাকাটাও তো একটু অদ্ভুত। টিট্‌কিরি দিয়েও আমায় যা সে জানিয়েছিল, তাতে এতদিনে তার তো সিংহ-শিকারে বেরিয়ে যাবার কথা। আড্ডিস আবাবায় প্লেন থেকে নামবার পর এ ক'দিনের মধ্যে কোথাও আর না দেখে আমি তার কথাটা সত্যি বলেই ধরে নিয়েছিলাম।

এতদিন সে ছিল কোথায়? লুকিয়েই বা ছিল কেন?

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। রহস্য কিছু থাক বা না থাক, শেষ পর্যন্ত ভালো করে ব্যাপারটা না বুঝে আমি ফিরব না ঠিক করে ফেলেছি।

ইব্‌ন ফরিদকে নিয়ে শিকারী তার বড় তাঁবুটায় ঢোকবার পরই অত্যন্ত সন্তর্পণে তাঁবুর বাইরে গিয়ে বসলাম।

নিস্তব্ধ রাত। ঘোড়াদের নিশ্বাস আর পা ঠোকার শব্দ ছাড়া মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক থেকে হায়নার হাসি শুধু শোনা যাচ্ছে।

ভেতরে কথাবার্তা চলছে বুঝতে পারছি, কিন্তু তাঁবুর কাপড়টা বেশ মোটা। দু একটা শব্দ ছাড়া ভালো করে কোন কথা বোঝা যাচ্ছে না।

কথাবার্তা ফরাসীতেই চলছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দুজনের কারুরই যে ফরাসী মাতৃভাষা নয়, যেটুকু শুনতে পাচ্ছিলাম তার উচ্চারণ ও বলার ধরন থেকেই বুঝলাম।

শিকারী লোকটির সঙ্গে আড্ডিস আবাবার বাজারে ইথিওপিয়ার অ্যামহারিকেই আলাপ হয়েছিল। তাতে তাকে হাবসি ভাবিনি, ভাবার কোন কারণও ছিল না। রোদে পোড়া চেহারাটা একেবারে কড়া তামাটে হয়ে এলেও তার মুখ-চোখের গড়ন থেকে চুলের রঙে বোঝা যায় মধ্যোপসাগরের উত্তরে ইওরোপের কোনো দেশের সে লোক। এদেশে অনেকদিন থেকে ভাষাটা দেশের লোকের মতই বলতে শিখেছে।

এখন কিন্তু তার অশুদ্ধ ফরাসী উচ্চারণেও কি যেন একটা ইঙ্গিত পাচ্ছিলাম। মদ্রদেশের অনেকের ইংরাজী উচ্চারণে যেমন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ধরা যায়, এও অনেকটা প্রায় তাই।

ফরাসীটা চোস্ত শিখেছিলেন বটে ঘনাদা!—শিবু হঠাৎ ফোড়ন পেড়ে বসল,—ভুল উচ্চারণ শুধু ধরে ফেলেন না, তা থেকেই ভুল যে করে তার জাতের খবর পর্যন্ত বার করে ফেলেন!

ঘনাদার সিগারেটটার ধোঁয়াতে আমরা হঠাৎ বোধহয় কাশতে শুরু করলাম। সে কাশিকে হাসি চাপার চেষ্টা বলে যদি কেউ সন্দেহ করে আমরা নাচার।

ঘনাদা অন্ততঃ করলেন না। শিবুর তারিফটা একটু হেসে অম্লান বদনে

হজম করে বলতে শুরু করলেন—লোকটা গ্রীক বলে বুঝলাম। শুধু ওইটুকু নয়, বুঝলাম তার চেয়ে আরেকটু বেশী। জন্তু-জানোয়ারের চামড়া শিকারই লোকটার ব্যবসা হতে পারে, কিন্তু সে নেহাৎ সাধারণ শিকারী মাত্র নয়। ইব্‌ন ফরিদ তো নয়ই। একটা দুটো কথা যা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম, তা শিকারের জগতের নয়।

নিউক্লিয়ার ফিসন্‌ অর্থাৎ পরমাণবিক বিস্ফোরণ কোথায় লাগে কিংবা বিজ্ঞানে সত্যিকার যুগান্তর, এ ধরনের কথা কালোচিতার খোঁজে যে ইথি-ওপিয়ারও পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায়, অথবা বুনো সিংহ-শিকারে যার নেশা, সেরকম লোকদের আলাপের বিষয় হওয়া একটু আশ্চর্য।

আরো একটু ভালো করে যদি শুনতে পেতাম! সেই চেষ্টাতেই তাঁবুর কাপড়ের গায়ে কানটা ভালো করে লাগাতে গিয়েই কেলেঙ্কারী করে ফেললাম। আর তাতেই শাপে বর হয়ে গেল।

তাঁবুর গায়ে কানটা লেপটে লাগাতে গিয়ে অসাবধানে তাঁবুর বাইরের একটা খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে কেমন করে হাত ঠেকে গেছল।

তাঁবুটা একটু তাতে নড়ে উঠতেই চারিদিক কাঁপিয়ে দড়াম দড়াম করে দুটি পিস্তলের গুলি ছুটল।

দুটোই কানের পাশ দিয়ে তো?—শিবুর আবার সরল জিজ্ঞাসা।

না—ঘনাদার গলাটা একটু বেশী ভারী শোনাল।

সন্ত্রস্ত হয়ে আমরা শিবুকে ধমকালাম,—শিবুটার কেমন বুদ্ধি! দুটোই কানের পাশে হয় কখনো? রবার্ট ব্লেকের গল্প পেয়েছিস!

শিবুর দিকে পিস্তলের নলটার মতই অগ্নিদৃষ্টি ফেলে ঘনাদা বললেন,—দুটো গুলিই কাছাকাছি একেবারে মাথার ঠিক ওপর দিয়ে। খানিকটা চুলের ডগা পুড়েই গেল তাতে।

হাসি দূরে থাক আমরা কাশি পর্যন্ত চেপে রইলাম প্রাণপণে।

ঘনাদা আমাদের তদ্গত চেহারাগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে

আবার শুরু করলেন—স্পষ্ট তারপর শুনতে পেলাম গ্রীক শিকারী বলছে,—আপনি কি ক্ষেপে গেলেন নাকি ফরিদ সাহেব ? গুলি ছুঁড়লেন কাকে ?

কেউ যদি থাকে ?—বলে ইব্‌ন ফরিদ হাসল,—আপনি বুঝতে পারছেন না মঁসিয়ে সোলোমাস। সাবধানের মার নেই। তাঁবুটা কি রকম নড়ে উঠল দেখলেন ? কেউ থাকতেও পারে ওখানে।

থাকতে পারে দুটো-একটা হায়না।—সোলোমাসের গলাটা প্রসন্ন নয়,—রাত্রে মাঝে মাঝে তাঁবুর আশেপাশে খাবারের গন্ধ শুঁকে অমন ঘোরে। দিলেন তো তাঁবুটা ফুটো করে।

আরে, ও ফুটো ক্যাম্বিসের তাঁবুর বদলে রাজপ্রাসাদ পাবেন থাকবার, কাজটা যদি হাসিল হয়। আচ্ছা, তাঁবুর বাইরেটা একবার ঘুরে দেখে এলে হয় না ?—ইব্‌ন ফরিদের সন্দেহটা তখনও যায় নি বোঝা গেল।

আমি সবে গা ঢাকা দেবার জন্যেই তৈরি হচ্ছিলাম। কিন্তু সোলোমাসের কথায় আশ্বাস পেলাম।

সোলোমাস তখন বলছেন,—মানুষ হলে না লাগলেও ভয়ে একবার চেঁচাত। জানোয়ার হলেও তাই। মিছিমিছি আপনি জেগে স্বপ্ন দেখছেন। এখন কাজের কথা সেরে ফেলুন তাড়াতাড়ি।

এত স্পষ্ট সব কথা শুনতে পাওয়ার কারণ তখন আমি বুঝে ফেলেছি। তাঁবুর ওই দুটো পিস্তলের গুলির ফুটোই আমার সহায় হয়েছে।

ফুটো দুটো কাছাকাছি হওয়ায় আরো সুবিধে। আলতো ভাবে তাতে কান ঠেকিয়ে কাজের কথাও শুনলাম।

ফরিদ তখন বলছে,—ওই চিমসে কালা ছুঁচোটাই আমাদের ভরসা। হাঁটা পথে এখান থেকে যদি কোথাও যায় তো আপনি আছেন, আর উড়ে কোথাও যেতে চাইলে আমি। আসল ঘাঁটি ওরই শুধু জানা। সেখানেই চলেছে যতটা পারে এলোমেলো ঘুরে-ফিরে সকলের চোখে ধুলো দিতে। ওকে নজরে রেখে পিছু নিলেই কাম ফতে। হতভাগা জানেও না যে, যমকে

ফাঁকি দিতে পারে, তবু আমাকে নয়। কাজটা শেষ করে যমের চেহারাই ওকে দেখাব।

দুচারটে অন্য কথা বলে ফরিদ তাঁবু থেকে বেরুল। বেরোবার সময় সোলোমাসের টর্চটা ধার নিয়ে তাঁবুর পেছনটা তদারক করে দেখে যেতেও ভুলল না।

হ্যাঁ, আপনারই। তাঁবুর পিছনে বসে সবই তো শুনেছেন।

আমি তখন সেখান থেকে সরে গিয়েছি অবশ্য।

ফরিদ চলে যাওয়ার পর ধীরে-সুস্থে গিয়ে সোলোমাসের তাঁবুর পর্দাটা সরালাম।

সরাতে না সরাতে সত্যই অবাক।

আসুন দাস!—বলে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সোলোমাস আমার দিকেই ফিরে দাঁড়িয়ে হাসছেন,—আপনার অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমার অপেক্ষায়?—আমি সন্দিগ্ধ ভাবে সোলোমাসের দিকে তাকালাম।

হ্যাঁ আপনারই। তাঁবুর পেছনে বসে সবই তো শুনেছেন।

আমিই যে তাঁবুর পেছনে ছিলাম, তাও আপনি জানতেন!—আমি সত্যই অবাক।

প্রথমে কি আর ঠিক জানতাম! কিন্তু দুটো গুলির পরও না চিৎকার, না পালাবার শব্দ শুনে বুঝলাম একটি মানুষ ছাড়া দুনিয়ায় আর কারো পক্ষে এ মনের জোর সম্ভব নয়।

সেই একটি মানুষের এত পরিচয় আপনি জানলেন কি করে?

সোলোমাস হাসলেন,—তাহলে আর তাঁবুর পেছনে শুনলেন কি? আপনার পরিচয় জানাই তো আমাদের আসল কাজ। পরিচয় না জেনে কি আপনার পিছু নিয়েছি?

তাহলে আমার পিছু নিয়েছেন সে কথা স্বীকার করছেন!—আমি ভেতরে ভেতরে গোলমালে পড়লেও বাইরের কড়া গলায় তা বুঝতে দিলাম না।

না স্বীকার করে উপায় কি! বিশেষ নিজের কানেই সব যখন শুনে ফেলেছেন।

ক্রমশ আমিই যেন বেকায়দায় পড়ছিলাম কথা-কাটাকাটিতে। তাই একটু রেগেই বললাম,—আমিই তাঁবুর পেছনে ছিলাম বুঝেও ফরিদ সাহেবকে হায়নার কথা বলেছিলেন কেন?

আলাপ-আলোচনাটা দীর্ঘ হবে মনে হচ্ছে,—সোলোমাস হাসলেন,—আপনারও অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করবার আছে, আমারও কিছু বলবার। সুতরাং এমন ভাবে দাঁড়িয়ে না থেকে একটু বসলে হত না! এত রাত্রে আপনাকে আর কি দিয়ে আপ্যায়িত করতে পারি। খাঁটি জংলী মধু

থেকে তৈরি আবিসিনিয়ার নামকরা তেজ আছে। বসুন। তাই একটু চাখতে দিই।

না, তার দরকার হবে না। আমি এমনিই বসছি। এখন আমার কথাগুলোর জবাব দিলে বাধিত হব।—বলে আমি চিতার চামড়ায় ঢাকা একটা নীচু কৌচের উপর বসলাম।

সোলোমাসও পাশে একটা মোড়া টেনে বসে বললেন,—কেন ফরিদ সাহেবকে হায়নার কথা বলেছিলাম এই কথা জানতে চাইছেন তো? বলেছিলাম ফরিদ সাহেবকে ধোঁকা দেবার জন্যে। হায়নারা রাত্রে শহরের রাস্তায় ধাঙ্গড়ের কাজ করে ঘোরে, আমার তাঁবুর দড়ি নাড়তে তারা কখনো আসে না আমি জানি।

ওঃ, আমায় তাহলে অনুগ্রহ করেছিলেন! এ অনুগ্রহের কারণ—এবারে সত্যি অবাক হওয়ার দরুন বিদ্রূপের সুরটা ঠিক গলায় ফুটল না।

অনুগ্রহ নয় আত্মরক্ষা যদি বলি!

আত্মরক্ষা! আপনি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন?—আমি জ্বলে উঠলাম,—শত্রুকে বাঁচাবার চেষ্টা আপনার আত্মরক্ষা!

কথাটা একটু গোলমেলে বটে!—সোলোমাস হাড়-জ্বালানো হাসি হেসে বললেন,—আমি অবশ্য বলতে পারি শত্রুকে বাঁচানই এ ক্ষেত্রে আমাদের আত্মরক্ষা। ফরিদ সাহেব আহাম্মুখ, তাই না বুঝে শুনে অমন গুলি ছুঁড়েছিল! আপনি মারা গেলে আমাদের নিজেদেরই তো সর্বনাশ। যা খুঁজছি তার পথ দেখাত তাহলে কে!

এই তাহলে আপনার কৈফিয়ৎ? কিন্তু মারা তো আরেকটু হলে গিয়েছিলাম, টিপটা একটু না দৈবাৎ ফসকালে!

দৈবাৎ যেটা ভাবছেন, তার পিছনে মানুষের হাতও তো থাকতে পারে! এই সোলোমাসেরই হাত।

আমি বিস্ময় সামলে ওঠার আগেই সোলোমাস এবার গম্ভীর হয়ে

বললেন,—হ্যাঁ, আমিই গুলি ছোঁড়বার সময় হঠাৎ চমকাবার ভান করে হাতটা তার একটু ওপর দিকে নাড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কেন? তখনও তো আপনি জানেন না যে আমিই ওখানে আছি।

ঠিক জানি না, কিন্তু আশা একটু করছিলাম বই কি! আপনার এত খবর আমরা রাখছি, আর আপনি আমাদের এই ডেরার খবর নিতে একবার আসবেন না তদন্তে, এ কি হতে পারে।

মনে মনে লজ্জিত হয়ে অবশ্য স্বীকার করলাম যে ইব্‌ন ফরিদকে ঠিক বুঝেও সোলোমাসকে একেবারেই সন্দেহ করতে পারিনি। মুখে কিন্তু ঝাঁজের সঙ্গে বললাম,—আমি আসব তাও জানতেন, এসেছি কি না এসেছি ঠিক না জেনেই প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন, এখন আবার আমারই অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলেন! আপনার রহস্যটা কি বলুন তো? সাপ নেউল দুইএর মাথাতেই হাত বুলোতে চান নাকি!

একরকম প্রায় ধরে ফেলেছেন! অন্তত ফরিদ সাহেবের খুব হিতৈষী যে নয়, তা বোঝা উচিত।

হিতৈষী তাহলে কার?—সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

আপনাদের।—সোলোমাসের এবার স্পষ্ট উত্তর।

তাহলে ফরিদ সাহেবের দলে কেন?

চোরের উপর বাটপাড়ি করবার জন্যে!—সোলোমাস হাসলেন।

হাসিতে চটে গিয়ে বললাম,—বিশ্বাস করব কিসে?

প্রমাণ দিলে।—সোলোমাসের জবাবে কোন দ্বিধা নেই।

দিন প্রমাণ তাহলে!—আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সোলোমাসের দিকে তাকালাম।

ধরুন, যদি বলি রেনে লাভাল?—সোলোমাসের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা গেল।

ও নাম শত্রুরা সবাই জানে।—আমিও অবিশ্বাসের হাসি হাসলাম এবারে।

তাহলে এমন কিছু বলি যা শত্রুদের জানবার কথা নয় ?

তাই তো শুনতে চাইছি। আমি কড়া গলায় বললাম।

মোট একশো সাঁইত্রিশ।—বলে সোলোমাস আমার দিকে চেয়ে মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

আমি তখন সত্যই চমকে গেছি। কোন রকমে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম।—ক'রকম মিলিয়ে ?

পাঁচ। চটপট জবাব দিলেন সোলোমাস।

আমি সত্যই তাজ্জব।

আমরাও। গৌর ত' বলে ফেলল,—ভারী মজার ধাঁধা তো ঘনাদা !

হ্যাঁ, সাঙ্ঘাতিক মজার ! সে মজার ধাঁধার উত্তর খুঁজতে বাঘা বাঘা বৈজ্ঞানিকেরা সারা দুনিয়ায় তখন হিমশিম খাচ্ছে, আর শয়তানেরা ছলে বলে কৌশলে তা আদায় করবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।—ঘনাদা সিগারেটটায় কয়েকটা রাম টান দিয়ে ফেলে দিয়ে বলতে শুরু করলেন,—সোলোমাস অন্ততঃ সে শয়তানের দলের নন এটুকু তখনও বুঝলাম। কারণ, যেটুকু তিনি বলেছেন শয়তানের কারুর তা কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সত্যি তাহলে সোলোমাস কে ? শত্রুর দলে তিনি এমন করে পরিচয় ভাঁড়িয়ে আছেনই বা কেন ? চোরের ওপর বাটপাড়ি করাই তাঁর উদ্দেশ্য বলছেন। সত্যিই কি তাই ? চোরের ওপর বাটপাড়ি তিনি করছেন কি স্বার্থে ? কার হয়ে ?

এসব প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরছিল বলেই খানিকক্ষণ চুপ করে ছিলাম।

সোলোমাসই হেসে বললেন,—আপনি খুব মুশকিলে পড়েছেন বুঝতে পারছি দাস। আরো একটা প্রমাণ তাই দিচ্ছি। এমন অকাট্য প্রমাণ যা পেলে অবিশ্বাসের আর কোনো কারণ থাকবে না আশাকরি।

একটু থেমে যেন আমার মুখের ভাবটা পরীক্ষা করে সোলোমাস বললেন,—আপনার এখান থেকে নাইরোবী যাবার কথা। কেমন ঠিক না ?

এবার আমি একেবারে থ। আমায় গোপন নির্দেশ যে পাঠিয়েছে, সে এবং আমি ছাড়া দুনিয়ায় এ খবর আর কারুর জানার কথা নয়। আডিডস আবাবা থেকে যে নাইরোবী যেতে হবে, এখবর আমি নিজেই ইয়েমেন থেকে রওনা হবার আগে জানতাম না। ঠিক রওনা হবার কিছু আগে সুইজারল্যাণ্ডের এক ব্যাঙ্কের ছাপমারা লেফাফার ভেতর সঙ্কেতলিপিতে এই নির্দেশ এসেছে যে, আডিডস আবাবার বিশেষ একটি হোটেলে ক'দিন থেকে আমি যেন নাইরোবীতে রওনা হই। সেখান থেকে কোথায় যেতে হবে তার নির্দেশ নাইরোবীর একটি সুইস ব্যাঙ্কের শাখাতেই পাবো।

সোলোমাসকে অবিশ্বাস করার আর কোন মানেই হয় না। কিন্তু তাঁর রহস্যটা কি তা না বুঝলে আর আমার শান্তি নেই।

তাঁর অনুমান যে ঠিক, একথা অকপটেই স্বীকার করে বললাম—আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু যে খবর শত্রুপক্ষের তো নয়ই, মিত্রপক্ষেরও কারুর জানা অসম্ভব, তা আপনি জানলেন কি করে? আমি এসব নির্দেশ কার মারফত পাই তা জানেন কি?

জানি বই কি!—সোলোমাস হাসলেন—কোনো সুইস ব্যাঙ্কের মারফৎ।

যে কোনো সুইস ব্যাঙ্ক মক্কেলদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে কিরকম বিশ্বাসী তাও নিশ্চয় জানেন!—অবাক হয়ে আমি বললাম—মরা মানুষের পেট থেকে কথা বার হতে পারে, কিন্তু তাদের পেট থেকে হবে না। তাহলে আপনি এ খবর পেলেন কি করে?

সোজা উত্তরটা বুঝতে পারছেন না কেন?—সোলোমাস যেন আমার নির্বুদ্ধিতায় একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন,—আমিও সুইস ব্যাঙ্কের মারফতই ওই খবরটা পেয়েছি। শুধু ওই খবরটুকু নয়, ওটা বাতিল করার নির্দেশও!

তার মানে?

তার মানে নাইরোবীতে নয়, আপনাকে এখন যেতে হবে সুডানের খার্তুম শহরে। নাইরোবী যাওয়া বাতিল করে এই নির্দেশ এসেছে।

মাথাটা সত্যিই গুলিয়ে যাচ্ছিল। যে আজগুবি টহলে একমাস আগে প্যারিস থেকে রওনা হয়ে ইওরোপের ও এশিয়ার নানা শহরে টক্কর খেতে খেতে ইথিওপিয়ার এই রাজধানীতে এসে পড়েছি, তাতে মাথা স্থির রাখা কঠিন। কিন্তু সোলোমাস সে অস্থির মাথাটি যেন চরকি বাজির মত ঘুরিয়ে দিয়েছেন।

একটু নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম,—এ নির্দেশ আমার কাছে না এসে আপনার কাছে এসেছে কেন?

বোধহয় আরো নিরাপদ করবার জন্যে।

কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দেখা তো না হতেও পারত? আমিও দৈবাৎ আজ এখানে এসে পড়েছি।—এবার মনে হল অকাট্য যুক্তি দিয়েছি।

দৈবাৎ এসেছেন সত্যি। আর দৈবাৎ না এলে বাধ্য হয়ে আমাকেই যেতে হত খবরটা পৌঁছে দেবার জন্যে। তবে আপনার মত লোক ইব্‌ন ফরিদের সূত্র ধরে আমার কাছে পৌঁছতেন-ই আমি জানি। তাই তখন বলেছিলাম, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করেছি। শহরের বাজারে সেদিন আমি নিজে যেচে যে আপনার সঙ্গে আলাপ করেছিলাম, সে কথাও আশাকরি মনে আছে?

এত ব্যাখ্যাতেও ব্যাপারটা আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার হল না। সোলোমাসের নিশ্চিত ধারণা দেখলাম, ইব্‌ন ফরিদের সূত্র ধরে তাঁর কাছে আমি পৌঁছতাম-ই। এই ধারণা কেমন করে এত দৃঢ় হল আমি বুঝতে পারলাম না। ইব্‌ন ফরিদকে যাই সন্দেহ করে থাকি, তোড়জোড় করে অনুসরণ করার মত দাম তার আছে বলেও মনে হয়নি।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসেই কি ফরিদকে অগ্রাহ্য করেছি! আর এই অগ্রাহ্য করাটা অনুমান না করতে পেরেই সোলোমাস অমন ধারণা করেছেন!

নিজের সন্দেহ-সংশয় আপাতত চাপা দিয়ে এবার অন্য প্রশ্ন করলাম,—

ইব্‌ন ফরিদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ হল কি করে? কি করে তার দলে ভিড়লেন?

ভিড়লাম চেষ্টা করে। এ ব্যাপারে আসল শনি যে কারা, তা তো আমাদের অজানা নয়। সুতরাং তাদের ওপর নজর রাখতে তাদেরই দলে ভিড়বার ছল করতে হয়।

সে ছলে তারা ভুলবে কেন?—একটু কড়া হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

যাতে ভোলে, তার জন্যে পাঁচটা ঝুটোর মধ্যে একটা সাচ্চা খবর দিয়ে তাদের বিশ্বাস জাগাতে হয়।

তার মানে শত্রুদেরও সত্যিকার গোপন খবর আপনি জুগিয়েছেন?——অবাক আর নয়, এবার আমি জ্বলে উঠলাম।

বললাম তো, সোলোমাস নির্বিকার ভাবে বললেন,—তাদের বিশ্বাস করবার জন্যেই দিতে হয়েছে। অবশ্য এমন খবর দিয়েছি যাতে শেষপর্যন্ত কোন ক্ষতি হবার নয়।

যেমন?

যেমন ইয়েমেন থেকে আপনি আডিডস আবাবা আসছেন।

এই খবর আপনি দিয়েছেন!—আমি একেবারে আগুন হয়ে উঠলাম—ওই ফরিদকে?

হ্যাঁ দিয়েছি, তাতে লোকসান হয়েছে কি?—সোলোমাস হাসলেন।

আপনি কি বারুদ নিয়ে খেলা করছেন জানেন?

জানি, বারুদ নিয়েই আমাদের খেলা।—গম্ভীর হয়েই সোলোমাস বললেন এবার।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইলাম নিজের কর্তব্যটা স্থির করবার জন্যে। সোলোমাসকে অবিশ্বাসও যেমন করতে পারা যায় না, তেমনি বিশ্বাসও নয়। কি তাঁর প্যাঁচ, কি তাঁর মতলব কে জানে? হয়তো শত্রুপক্ষের চর হয়ে আমার ওপরও টেক্কা দেবার এটা এক নতুন ফন্দি।

মুখে সে-সব কিছু না জানিয়ে চলে আসার আগে শুধু বললাম—আপনার কথা মতই আমার রাস্তা বদলাচ্ছি। এর ভেতর চালাকি যদি কিছু থাকে—

তাহলে খার্তুমে গেলেই ধরা পড়বে।—সোলোমাস নিজেই কথাটা পূরণ করে দিলেন।

খার্তুমে গিয়ে সোলোমাসের নির্দেশ যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণও যেমন পেলাম, সেই সঙ্গে আরেকটা এমন ব্যাপার দেখলাম, যেটা অত্যন্ত সন্দেহজনক।

ওখানকার সুইস ব্যাঙ্কের শাখায় সই দিয়ে সত্যিই একটা শীলমোহর-করা নতুন নির্দেশের খাম পেলাম। খামটা নিয়ে খার্তুমের সবচেয়ে খানদানী রাস্তা খেদিভ আভেন্যু ধরে খেদিভ আর ভিক্টোরিয়া অ্যাভেন্যুর মোড়ে যেখানে উটের পিঠে বসা জেনারেল গর্ডনের বিরাট ব্রঞ্জের মূর্তিটা স্থাপিত সেখানে পর্যন্ত এসেছি, এমন সময়ে দূরের আব্বাস স্কোয়ারের দিকে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়ালাম। আব্বাস স্কোয়ারের মাঝখানের জোড়া মিনারের বিরাট মসজিদের কাছ থেকেই যে-লোকটা আসছে তাকে দূর থেকে দেখেও চিনতে যেমন ভুল হবার কথা নয়, তার খার্তুমে আসাও তেমনি অভাবনীয়।

লোকটা আর কেউ নয়—ইব্‌ন ফরিদ।

সোলোমাস কি তাহলে দু-মুখো সাপের শয়তানিই করেছে?

আমায় খার্তুম আসার নির্দেশ দিয়ে ফরিদকেও কি তা আবার জানিয়েছে!

না, আর ধোঁকার মধ্যে থাকার কোন মানে হয় না। ব্যাপারটার একটা ফয়সালা এখুনি আজই করে ফেলতে হবে।

ফরিদ আমায় দেখতে পায়নি। ভিক্টোরিয়া অ্যাভেন্যু দিয়ে সে খেদিভ অ্যাভেন্যুর দিকেই আসছে। গর্ডনের মূর্তির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে খানিক অপেক্ষা করে আমি ফরিদের পিছু নিলাম দূর থেকে।

ফরিদ খেদিভ অ্যাভেন্যুর একটা নাম-করা হোটেলে গিয়ে ঢোকবার কিছুক্ষণ বাদে সেখানে গিয়ে হোটেল-ক্লার্ককে জিজ্ঞাসা করে ঘরের নম্বর জেনে নিয়ে একেবারে সটান ইব্‌ন ফরিদের ঘরের দরজায় গিয়ে টোকা দিলাম। ফরিদের কামরার দরজায় কিন্তু 'বিরক্ত কোরো না' বিজ্ঞপ্তি লটকানো।

ভেতর থেকে বাঘের মত গলায় আওয়াজ এল—দূর হও। বাইরের নোটিস পড়তে পারো না!

কি করে পারব।—হিব্রু ভাষায় বললাম,—ইংরেজিটা যে জানি না।

খানিকক্ষণ ভেতরে আর কোন আওয়াজ নেই। তারপর আবার বাজখাঁই গলায় প্রশ্ন হল,—পড়তে পারো না তো আমার কথা বুঝলে কি করে?

ফরিদ সে কথা জিজ্ঞাসা করতে পারে অবশ্য। কারণ সে ইংরেজিতেই প্রথম ধমক দিয়েছিল।

বললাম,—শুনে বুঝতে পারলেই কি পড়তে পারা যায়! তুমি তো আরবী বলো খাসা, কিন্তু অক্ষর চেনো কি?

ওধারে এবার গর্জন শোনা গেল,—কে তুমি?

মোলায়েম মিষ্টি করে বলালাম,—ইব্‌ন ফরিদ।

দড়াম করে দরজাটা এবার খুলে গেল। ফরিদের মাংসের পাহাড়ে যেন ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

ও তুই—মানে আপনি!—ফরিদ চটপট সামলে নিয়ে বললে,—আসুন আসুন। তা, এরকম রসিকতার মানে কি?

কামরার ভেতরে ঢোকার পর ফরিদ দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে দেখে বললাম, যেন অবাক হয়ে—রসিকতা কোথায় দেখলেন?

ফরিদ গর্জন করতে পারলেই বোধহয় খুশি হত। তার বদলে অতি কষ্টে রাগ চেপে রেখে হাসবার চেষ্টা করে বললে,—ইব্‌ন ফরিদ নামটা নেওয়া যদি রসিকতা না হয় তাহলে মাপ চাইছি।

ইব্‌ন ফরিদ নামটা রসিকতা !—আমি যেন আকাশ থেকে পড়ে বললাম, —আপনি যদি ও নাম নিতে পারেন, তাহলে আমি নিলেই রসিকতা হবে কেন ?

ও নাম আমার নয় বলতে চান ? ফরিদ আর বুঝি নিজেকে সামলাতে পারে না।

তাই তো বলছি।—মধুর হেসে বললাম,—আপনি ইব্‌ন ফরিদ তো ন'ন-ই, আরবও আপনার দেশ নয়।

কথাটা বলে ফরিদের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। এবার হয় সে ফাটবে, নয় প্যাঁচ খেলবে।

শেষেরটাই ঠিক হল। দু এক মুহূর্ত কি ভেবে নিয়ে ফরিদ বললে,—মানলাম আপনার কথাই সত্যি, কিন্তু আপনি জানলেন কার কাছে ?

কারুর কাছে জানি-নি, নিজেই বুঝেছি। আপনি আরবী ভাষা যত ভালোই বলুন, সত্যিকারের আরব হলে অন্তত ইব্‌ন ফরিদ নামটার দাম জানতেন !

তার মানে ?—ফরিদ সত্যিই এবার একটু হতভম্ব :

মানে, ইব্‌ন ফরিদ যে পর্যটক ভূগোলবিদ্ নয়, আরবী ভাষার অদ্বিতীয় একজন সুফী কবি, এ খবর শিক্ষিত আরব মাত্রেই শুধু নয়, আরবী সাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয় যার আছে সে-ও জানে। ভূগোলবিদ্ পর্যটক হিসেবে যাঁর নাম-ডাক ছিল, তিনি ইব্‌ন ফরিদ নন, ইব্‌ন জুবের।

ফরিদ হাঁ করে আমার দিকে তখন তাকিয়ে।—বলেই ঘনাদা হঠাৎ ভ্রূকুটি করলেন।

আমাদের সকলেরই তখন কোথা থেকে কাশির ছোঁয়াচ লেগেছে।

শিশির সবার আগে সামলে উঠে লজ্জিত ভাবে বললে,—আপনার ঘরে লবঙ্গ আছে ঘনাদা ?

কেন ?—ঘনাদার গলা গম্ভীর।

এই সবাই একটা একটা চিবোতাম। গলাটা কেমন খুস খুস করছে কি না।

তা লবঙ্গ কেন ? উখো দিয়ে চাঁছো না।—শিবু ঠিক সময়মত সুর পাল্টে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল—না ঘনাদা, আপনি বলে যান। ভারী একটু কাশি তার জন্যে লবঙ্গ চাই, বচ্ চাই, বাসক সিরাপ চাই! কডলিভার অয়েল যে চাওনি এই আমাদের ভাগ্যি।

শিশির ও আমরা বকুনি খেয়ে যথাবিহিত কুঁকড়ে গেলাম।

ঘনাদা মানের গোড়ায় জল পেয়ে আবার শুরু করলেন,—ফরিদ খানিক একেবারে বোবা হয়ে থেকে তারপর বললে,—আমি ইব্‌ন ফরিদ হই বা না হই, আরব আমার দেশ হোক বা না হোক, তাতে আপনার কি আসে যায় যে আড্ডিস আবাবা থেকে এই খার্তুম পর্যন্ত পিছু নিয়ে এই হোটেলে এসে ধাওয়া করেছেন।

ফরিদের গলায় রাগের ঝাঁজ কিন্তু নেই। সে যেন অন্য মানুষ। নামই ভাঁড়াক আর যাই করুক, সে যেন কারুর সাতে-পাঁচে নেই। শুধু নিজের খুশিতে একটু দেশবিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি কেন মিছিমিছি তার পিছু নিয়ে তাকে বিব্রত করছি এই তার নালিশ।

ফরিদের তালেই তাল দিয়ে তার দিকে চেয়ে মুচকে হেসে বললাম,—শুধু কি আড্ডিস আবাবা থেকে ? পিছু নিয়েছি সেই ইয়েমেন থেকে তা বুঝি জানেন না ?

আমি এই সুর ধরব ফরিদ ভাবতে পারে নি। তবু যথাসম্ভব নিরীহ ভালো-মানুষের মত জিজ্ঞাসা করলে,—কেন নিয়েছেন তাইতো জানতে চাইছি।

তাহলে আমার মুখ থেকেই শুনতে চান! হো হো করে হেসে উঠে তার পিঠে একটা দোস্তির আদরের চাপড় দিয়ে বললাম,—আসুন তাহলে বসা যাক।

ফরিদ তখন মেঝেতেই উপুড় হয়ে বসে পড়েছিল অবশ্য।

আরে, ওখানে নয়। এই আপনার সোফায়। বলে হাত ধরে তাকে তুলে সোফায় বসিয়ে দিলাম।

ধরা হাতটা আরেক হাতে টিপতে টিপতে যেভাবে সে আমার দিকে তাকাল, তাতে তার চোখে ঠিক বন্ধুত্বের প্রীতি উথলে উঠছে বলে মনে হল না।

যেন সেসব কিছু লক্ষ্য না করেই তার পাশে বসে পড়ে বললাম,—কেন আপনার পেছনে ছিনে জোঁকের মত লেগে আছি জানেন? বছর দুয়েক হল একটা মানুষ ফ্রান্স থেকে নরওয়ে যাবার পথে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এমন কত লোকই তো যায়। বিভিন্ন দেশের পুলিস কিছু দিন একটু খোঁজ-খবর হৈ-চৈ করে, তারপর নামটা খরচের খাতায় লিখে দেয়। আর সব দেশের পুলিস তা করলেও ফ্রান্সের 'সুরেৎ' তা করেনি। না করাটা একটু আশ্চর্য! কারণ লোকটা বৈজ্ঞানিক বটে, কিন্তু কেও-কেট্টা কেউ নয়। পরমাণবিক বোমা কি গ্রহান্তরে যাবার রকেটের বারুদও তার গবেষণার বিষয় নয়। ফটো কেমিস্ট যাদের বলে, তিনি সেই জাতের রাসায়নিক। তাঁর নামটা বৈজ্ঞানিক মহলে পর্যন্ত খুব বেশী লোক জানে না। তাঁর নাম ধরা যাক রেনে লাভাল।

একটু থেমে ফরিদের দিকে চাইলাম। ফরিদ সোজা লোক নয়। রেনে লাভালের নাম শুনেও চমকাবার কোন লক্ষণ তার দেখা গেল না।

আবার বললাম,—রেনে লাভাল নিরুদ্দেশ হবার কিছুকাল পরে ক'টা মজার ব্যাপার ঘটল। দুনিয়ায় এক ফরাসী পুলিস দপ্তরে ছাড়া যার সম্বন্ধে কারুর কোন আগ্রহ নেই, সেই লাভালেরই প্যারিসের আগেকার বাসাবাড়িতে একদিন চুরি হল। লাভালের বাসাবাড়ি ফরাসী পুলিস তালাবন্ধ করে রেখেছিল। সেখানে দামী কোন জিনিসপত্রও ছিল না। তবু সে বাড়িতে পুলিসের প্রায় নাকের ওপর দিয়ে বেপরোয়া হয়ে কোন চোর কিসের লোভে

এল চুরি করতে ? চুরির পর পুলিস সব কিছু মিলিয়ে দেখল। জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায় নি। এমন কি নরওয়ে যাবার সময় বই কাগজপত্র যা লাভাল যেমন ভাবে রেখে গিয়েছিলেন, আর পুলিস বাড়িতে তালা দেবার সময় শুধু ওপর থেকে ফটো নিয়ে যা ছোঁয় নি, সে সব ঠিক তেমনি রাখা আছে। চোর তাহলে কিসের খোঁজে এসেছিল এত বিপদ ঘাড়ে নিয়ে ?

ফরাসী পুলিসের হাতে চোর শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ল। সাধারণ একটা দাগী সিঁধেল চোর। সে পুলিসের কাছে স্বীকার করলে যে, অচেনা একজন বিদেশী একটা বিশেষ ফরমাশ দিয়ে তাকে লাভালের বাসায় চুরি করতে পাঠিয়েছিল। তার জন্যে টাকাও দিয়েছিল।

প্রচুর বড়লোকের বাড়ির সিন্দুক ভাঙলেও অত টাকা পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কাজ হাসিল করতে পারলে আরো টাকা দেবে বলেছিল, এবং সে কথা সে বিদেশী রেখেছে।

কাজ তাহলে তুমি হাসিল করেছ ?—ওই অঞ্চলের কমিশেয়ার দ্য পুলিস স্বয়ং কড়া ধমক দিয়ে চোরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।

কিন্তু কড়া ধমক খেয়েও চোর হাসতে শুরু করেছিল। পাহারাদার পুলিসকে মারমুখো দেখে তারপর বলেছিল,—আজ্ঞে হাসিল করেছি বই কি! কিন্তু কাজটা কি শুনবেন ? শুনলে আপনারাও হাসবেন।

কি কাজ বলো ? আবার ধমক দিয়েছিলেন কমিশেয়ার।

আজ্ঞে, কাগজ-ফেলার ঝুড়ির ছেঁড়া কাগজগুলো নিয়ে গিয়ে সেই বিদেশীকে দেওয়া। ছেঁড়া কাগজের বদলে নোট পেয়েছিলাম গাদা-গাদা। —চোরটা হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলেছিল। কমিশেয়ার ভেতরে ভেতরে চমকে উঠলেও বাইরে তা বুঝতে দেন কি কাউকে। জিজ্ঞেস করেছিলেন আবার,—আর কিছু নাও নি তুমি ? ঠিক করে বলো ?

আজ্ঞে, ঠিক বলেছি। মা মেরীর দিব্যি!—চোরটা সত্যি কথাই বলছে মনে হয়েছিল।

কমিশেয়ার বিদেশী অচেনা লোকটার চেহারার বর্ণনা জেনে নিয়ে চোরটাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

শুধু এই একটা ঘটনা নয়, এরকম আরো দু-একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। যে ল্যাবরেটরিতে লাভাল কাজ করতেন, খোঁজ করতে করতে জানা যায় যে, সেখানে তাঁর এক সহকারীকে তাঁর আগে থাকতেই পাওয়া যাচ্ছে না। সহকারী ফরাসী নয়, ইওরোপের ভিন্ন দেশের লোক। নিজের দেশে যাবে বলে ছুটি নিয়ে লাভাল নিরুদ্দেশ হবার মাস ছয়েক আগে সে চলে যায়। কিন্তু তারপর আর সে ফিরে আসে নি। লাভালের ব্যাপারটা নিয়ে টনক না নড়লে পুলিস সেই সহকারীর খোঁজ বোধহয় করতই না। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সত্যিই শেষ পর্যন্ত গোখরো বেরুল। ক্রমশ ফরাসী সরকার জানতে পারল যে, রেনে লাভালের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছনে গভীর রহস্য আছে কিছু। কিছুকাল থেকে তিনি যেন খুব ভয়ে ভাবনায় দিন কাটাচ্ছেন মনে হয়েছিল। ল্যাবরেটরির সহকর্মীদের তিনি বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু তিনি খুব যে বিপদের মধ্যে আছেন এই আভাসটুকু দিয়েছিলেন। বন্ধু ও সহকর্মীরা অবশ্য এসব কথার মানে তখন বুঝতে পারে নি। তাঁর নিরুদ্দেশ হওয়ার সঙ্গে এই সব ব্যাপার জড়িয়ে ফরাসী পুলিসের ধারণা হল যে, হয় রেনে লাভালকে তাঁর শত্রুরা কেউ কোথাও পাচার করেছে, কিংবা তিনি নিজেই গা-ঢাকা দিয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

ফরিদ কি বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে বললাম,—কিন্তু ফরাসী সরকারেরও যা অজানা সে কথা জানে মাত্র দু-একটি লোক। আপনি তাদের একজন।

আমি! ফরিদ আকাশ থেকে পড়ল যেন।

হ্যাঁ আপনি। আপনি জানেন যে চেষ্টা করলেও মঁসিয়ে লাভালকে শত্রুরা কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারে নি। তিনি নিজেই তাদের ফাঁকি দিয়ে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে আছেন। কেন তিনি গা-ঢাকা দিয়ে আছেন তাও আপনি

জানেন, আর ধরুন একজন পরম বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে তাঁরই গোপন নির্দেশ অনুসারে আপনি তাঁকে সাহায্য করতে তাঁর লুকোনো আস্তানায় চলেছেন।

এই পর্যন্ত বলে একটু থামলাম, তারপর ফরিদের চোখে চোখ রেখে কড়া গলায় আবার বললাম,—এখন মনে করুন আমি শত্রুপক্ষের চর, মনে করুন আপনার মারফত লাভালের গুপ্ত আস্তানা খুঁজে বার করবার জন্যে আমি সাবধানে ছায়ার মত আপনার পিছু নিয়েছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি তা জানতে পেরে গেছেন। তারপর এখন হাতে পেয়ে আমার সম্বন্ধে কি আপনি করবেন?

ফরিদ এতটুকু বিচলিত হল না এ কথাতেও। বরং শান্ত গম্ভীর স্বরে বললে,—বিশেষ কিছু করব না, শুধু আজ সুইস ব্যাঙ্কে গিয়ে যে নির্দেশ-দেওয়া লেফাফাটি এনেছেন, সেটি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে একটি গোল-কিক করে আপনাকে দরজার বাইরে পাঠিয়ে দেব।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে একটা ছোট রিভলভার বার করে সে আমার দিকে তখন ধরেছে।

সেদিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বললাম, সত্যিকার রিভলভার মনে হচ্ছে।

শুধু সত্যিকার রিভলভার নয়,—ফরিদ হিংস্রভাবে হেসে সেফ্‌টি ক্যাচটা সরিয়ে বললে,—ছ'-ছটা গুলি ভরা আর সেফ্‌টি ক্যাচটাও সরানো। একটু ট্যাঁ ফুঁ করলেই ওই চিমসে বুকটা ঝাঁঝরা করে দেব!

কিন্তু তাতে বড় বেশী বিশ্রী আওয়াজ হবে না? হোটেলের লোকেরা চমকে উঠতে পারে। এমন কি পুলিস-টুলিস নিয়ে ছুটেও আসতে পারে এঘরে। সুডানী পুলিস বড় বেয়াড়া শুনেছি।

সুডানী পুলিস ঘুণাক্ষরেও কিছু জানবে না, এবিষয়ে নিশ্চিত থাকতে পারেন!—ফরিদ কুটিল হাসির সঙ্গে চিবিয়ে চিবিয়ে বললে,—কারণ, এ হোটেলের মালিক থেকে চাকর পর্যন্ত কেউ সেনর সাবাটিনির ঘরে কি হচ্ছে উঁকি দিয়ে দেখতেও সাহস করবে না।

ও, আপনি তাহলে সেনর সাবাটিনি !—আমি পরিচয় জেনে ধন্য হবার ভাব দেখালাম।

আমি যেই হই,—ফরিদ মানে সাবাটিনি কড়া গলায় বললে,—তোর পকেটের লেফাফাটা এবার বার কর দেখি ছুঁচো ! এখন বুঝতে পারছিস বোধহয়, ও লেফাফা সঙ্গে নিয়ে সিংহের গুহায় ঢুকে কি বোকামি করেছিস ! অবশ্য, ও লেফাফা তোর কাছ থেকে কেড়ে নিতামই ! সেই জন্যেই আমার খার্তুম আসা। শুধু হ্যাঙ্গামাটা তুই বাঁচিয়ে দিলি এই যা !

আমি যেন প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললাম,—এ লেফাফা আপনাকে দিতে হবেই ? না নিয়ে আপনি ছাড়বেন না ?

না ছাড়ব না। ভালোয় ভালোয় দিস তো জ্যান্ত এ ঘর থেকে বেরুতে পারবি। আর না দিলে লেফাফা তো যাবেই, সেই সঙ্গে প্রাণটা।—সাবাটিনির কি সে উল্লাসের হিংস্র হাসি !

কিন্তু এ লেফাফা নিয়ে কি লাভ আপনার হবে !—আমি কাতর ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলাম,—রেনে লাভাল নিরিবিলিতে কোথায় একটু লুকিয়ে আছেন, তাঁকে কেন মিছিমিছি জ্বালাতন করবেন ?

কেন জ্বালাতন করব ?—সাবাটিনি আবার হেসে উঠল, তাঁকে জ্বালাতন কিছু করব না, শুধু তাঁকে তাঁর যন্ত্রপাতি কাগজপত্র লটবহর সমেত এমন জায়গায় পাচার করব, যেখানে তাঁর গবেষণার কোন বিঘ্ন আর হবে না।

কোথায় ? আপনার নিজের দেশ ইটালীতে ?—আমার যেন দারুণ কৌতূহল।

না।—সাবাটিনি গর্জন করে উঠল,—কোথায় তাতে তোর কি দরকার !

ও বুঝেছি !—আমি ভালোমানুষের মত বললাম,—নামটা আপনার ইটালীয়ান হলেও আপনার দেশ জাত বলে কিছু নেই। ও সব বালাই ঘুচিয়ে আপনি শুধু নিজের স্বার্থের ধান্দাতেই ঘোরেন। রেনে লাভালকে পাবার জন্যে যারা সবচেয়ে বেশী দাম দেবে তাদের কাছেই তাকে বেচবেন।

চুপ কর ছুঁচো।—সাবাটিনি গর্জন করে উঠল,—তোর কাছে বক্তৃতা শোনবার আমার সময় নেই। সুবোধ ছেলের মত লেফাফাটা বার কর। আমি এক থেকে পাঁচ গুনছি। তার মধ্যে লেফাফা না দিলে এই রিভলবারই যা বলবার বলবে। এক···

দোহাই! দোহাই!—আমি কাতর অনুনয় জানালাম,—লেফাফাটা তো দিতেই হবে বুঝতে পারছি, কিন্তু তার আগে পৃথিবী থেকে চিরকালের মত অন্নাভাব ঘোচাবার কল্পনাতীত উপায় যিনি আবিষ্কার করতে চলেছেন, তাঁর গোপন ঠিকানাটা একটু দেখে নিতে দেবেন? সত্যি বলছি, শীলমোহর-দেওয়া খামটা খুলেও দেখিনি এখনো।

তাহলে এ জন্মে আর তা দেখা তোর ভাগ্যে নেই।—সাবাটিনি নির্মম-ভাবে হেসে উঠে গুনতে আরম্ভ করল,—এক···দুই···

সাবাটিনির পেছনে কামরার দরজা খোলার খুট করে একটু আওয়াজ হল।

সাবাটিনি চমকে উঠলেও আমার দিক থেকে চোখ বা পিস্তল কিছুই না ফিরিয়ে বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে,—কে?

পেছন থেকে চাপা গলায় আওয়াজ এল,—আমি সোলোমাস।

সোলোমাস!—সাবাটিনি হতভম্ব হল বুঝতে পারলাম কিন্তু তার চোখ আর পিস্তল আমার ওপরই নিবদ্ধ রইল। দাঁতে দাঁত চেপে শুধু বললে, —এখানে কেন?

শোনা গেল—তোমায় শেষ করতে!

আমি হাত তুলে সভয়ে চিৎকার করে উঠলাম,—ও কি করছেন, মঁসিয়ে সোলোমাস? পিস্তল ছুঁড়বেন না! আমার গায়ে গুলি লাগবে যে!

সাবাটিনি চমকে একটু পিছনে তাকাতেই তার হাতের রিভলবার এল আমার হাতে, আর সে তখন সোফার ওধারে চিৎপাত।

রিভলভারটার সেফটি ক্যাচ আবার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললাম,—উঠুন সেনর সাবাটিনি। মেঝেয় অমন শুয়ে থাকা কি ভালো!

সাবাটিনির কিন্তু ওঠবার কোন লক্ষণ তখনো নেই। একবার বন্ধ দরজা আর একবার আমার দিকে ভ্যাবাচাকা খেয়ে তাকিয়ে বললে,—সোলোমাস কোথায় গেল?

সাবাটিনি চমকে একটু পিছনে তাকাতেই তার হাতের রিভলবার এল আমার হাতে আর সে তখন সোফার ওধারে চিৎপাত।

সোলোমাস আবার যাবে কোথায়? আড্ডিস আবাবাতেই আছে। হেসে বললাম,—ভেন্‌ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌ বিদ্যেটা অনেক সময় খুব কাজে লাগে।

সাবাটিনি সেই বিরাট দেহ নিয়েও এবারে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে

বললে,—শয়তান, পাজি, ছুঁচো, শুধু তোর হাতে রিভলভার তাই, নইলে তোর হাড়-মাংস আমি আলাদা করে রাখতাম।

রিভলভারটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললাম,—ও আফসোস আপনার তাহলে আর রাখলাম না।

আমার কথা শেষ হতে না হতেই সাবাটিনি লাফ দিয়ে পড়ল। না, আমার ওপরে নয়, রিভালভারটা যেখানে ছুঁড়েছিলাম সেদিকে। কিন্তু সেখান পর্যন্ত তাকে পৌঁছতে হল না। তার শয়তানী বুঝেই সোফাটা তৎক্ষণাৎ ঠেলে দিয়েছিলাম। তার ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে সে দেয়ালের গায়ে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

সেখান থেকে তাকে তুলে একটা ধোবি পাট দিয়ে বললাম,—কি ভাগ্যি সেনর সাবাটিনি, আপনার ঘরে এ হোটেলের মালিক থেকে চাকর-বাকর কেউ উঁকি দিতে সাহস করে না, নইলে আপনার কাছে দুটো লড়াইয়ের প্যাঁচ শেখবার এ সৌভাগ্য হয়তো পেতাম না। হয়তো হোটেলের লোকেরা ভূমিকম্প হচ্ছে বলে এ ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকতে পারত।

সাবাটিনিকে একটা চরকি পাক দিয়ে মাটিতে ফেলে আবার বললাম—আপনার মত টনটনে ন্যায়নীতিবোধ কোথাও আমি দেখিনি। ধর্মযুদ্ধে অন্যের হাতে রিভলভার আপনি পছন্দ করেন না, কিন্তু নিজের হাতে সেটা রাখা ন্যায্য মনে করেন! আপনাকে আবার তাই একটা সেলাম জানাচ্ছি।

সাবাটিনি তার নিজের খাটের ওপরেই মুখ থুবড়ে পড়ে তখন কাতরাচ্ছে।

পকেট থেকে শিলমোহর দেওয়া চিঠিটা বার করে বললাম,—এ চিঠি আপনাকে খুলে এখন আমি দেখাতে পারি, কিন্তু দেখিয়ে কোন লাভ হবে কি? কারণ, এ চিঠির ঠিকানাতেই আমি নিজে এখন যাচ্ছি। আর সেখানে আপনার এই শ্রীমুখ দেখার কোন বাসনা কেন জানি না আমার হচ্ছে না! তা সত্ত্বেও যদি আপনি দেখাতে চান, তাহলে আশা করি উইল-টুইল করেই

যাবেন। অবশ্য কার জন্যেই বা করবেন? আপনার জন বলতে স্বয়ং শয়তান ছাড়া আর কে-ই বা আপনার থাকতে পারে!

কথাগুলো বলে বেরিয়ে যেতে গিয়েও আমায় ফিরে দাঁড়াতে হল। সাবাটিনি কাতরাতে কাতরাতেই তখন বিষঢালা গলায় বলছে,—ওই দুমুখো সাপ সোলোমাসই তোকে সব জানিয়েছে আমি বুঝেছি। কিন্তু এই আমি বলে রাখছি, ওই সোলোমাসের ছোবল তোকেও খেতে হবে। তোর নিপাত যাবার আর বেশী দেরি নেই।

সাবাটিনির অভিশাপ কানে নিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

খার্তুম থেকে বেরুবার আগেই সাবাটিনির অভিশাপ কিছুটা অন্তত ফলল।

সুইশ ব্যাঙ্কের সেই চিঠিটা যাবার দিনই কি ভাবে আমার তালা দেওয়া হোটেলের কামরায় আমার ব্রীফ-কেস থেকে যে চুরি গেল বুঝতে পারলাম না।

কি ভাগ্যি আমি লেফাফাটা খুলে আগেই পড়ে রেখেছিলাম। চিঠিটা পড়েই কেন যে পুড়িয়ে দিইনি এই আমার আফসোস।

কিন্তু আফসোস করে বা চুরির কিনারা করবার চেষ্টায় সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

চুরি যাবার দরুনই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে পরের দিন সকালেই একটি প্লেনে রওনা হয়ে পড়লাম। কিন্তু সেখানেও বাধা।

খার্তুম থেকে বেরিয়ে ঝড়ের মধ্যে পড়ে প্লেনটা জখম হয়ে কোনমতে ন্যুবিয়ার মরুভূমির দক্ষিণপ্রান্তে নীলনদী যেখানে হঠাৎ যেন পিছনে ফিরে যাবার জন্য বাঁক নিয়েছে, সেই ছোট শহর আবু হামেদ-এ গিয়ে নামল। সেখান থেকে তোড়জোড় করে অন্য প্লেনে কায়রো যেতে দিন দশেক লাগল। কায়রো থেকে অবশ্য সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকার আর এক প্রান্তে

আতলান্তিক সমুদ্রের ধারে এক গহন জংলী রাজ্যে গেলাম। লেফাফায় সেই নির্দেশই ছিল।

জংলী রাজ্যের নাম গ্যাবোঁ। জায়গাটা একেবারে অচেনা নয়। আফ্রিকার দুষ্প্রাপ্য গ্যালাগো ধরতে অনেক আগে একবার ওখানকার জঙ্গলে গেছলাম।

কি ধরতে গেছলেন?—শিবু হাঁদার মত জিজ্ঞাসা করে বসল।

গ্যালাগো।—ঘনাদা নামটা আবার বলে ধৈর্যের পরিচয় দিলেন।

গ্যালাগো?—গৌর উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—গরিলার মাসতুতো-পিসতুতো ভাই, না ঘনাদা?

না।—ঘনাদা অনুকম্পার সঙ্গে বললেন,—লেমুর যাদের বলে, সেইরকম আধা-বাঁদর একজাতের ছোট প্রাণী। কোনটা ইঁদুরের চেয়ে বড় হয় না।

মোটে ইঁদুর!—শিশির ফোঁস করে যেভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, তাতে মনে হল গ্যালাগো জানোয়ারটা তাকে ঠকিয়ে একেবারে পথে বসিয়ে দিয়েছে।

আমাদের ভাগ্য ভাল যে ঘনাদা সে দীর্ঘনিশ্বাস অগ্রাহ্য করে আবার শুরু করলেন,—বিষুবরেখার উত্তরে আতলান্তিকের ধারে এই ছোট রাজ্যটি ফরাসীদের অধিকারে। রাজ্যটি কঙ্গোরই প্রতিবেশী এবং কঙ্গোর সঙ্গে তার মিলও কম নয়। বেশীর ভাগই ঘন জঙ্গলে ঢাকা। এক একটা গাছ একশো থেকে দেড়শো হাত প্রায় লম্বা। বছরের অর্ধেক সময়ে নদী-নালা ভেসে জলা জঙ্গল একাকার হয়ে থাকে। সিংহের দেখা খুব বেশী না পাওয়া গেলেও আফ্রিকায় বিরল জানোয়ার ওকাপি ওই সব জঙ্গলে মেলে, তাছাড়া চিতাবাঘ আছে, এক জাতের লাল বুনো মোষ, সোনালী বেড়াল, বিরাট সব কাঠবেড়ালী আর ওই গ্যালাগো।

এই জংলী রাজ্যে ঠিকানা মনে থাকা সত্ত্বেও রেনে লাভালের আস্তানা খুঁজে বার করতে কম বেগ পেতে হল না। প্লেন তো নামিয়ে দিয়ে গেল

সমুদ্রের তীরের লিব্রেভিল বন্দরে। সেখান থেকে আঁকা-বাঁকা কুইলা নদীতে যতদূর সম্ভব মোটর-লঞ্চ ও তারপর জংলী ডিঙি বেয়ে, কোথাও বা হেঁটে বুনো হিংস্র আদিবাসীদের এড়িয়ে লাভালের নির্দেশ দেওয়া অঞ্চলে পৌঁছতে প্রায় দু' হপ্তা লেগে গেল।

এই অঞ্চলটায় দুর্ভেদ্য বনজঙ্গল শেষ হয়ে গিয়ে পাহাড়ী উপত্যকা শুরু হয়েছে। ওকান্দে জাতের যে সব বাহকেরা এতদূর আমার মালপত্র বয়ে বয়ে সঙ্গে এসেছিল, তারা আর যেতে চাইলে না। সামনে ফাঙ্গ বলে আরেক জংলীজাতের এলাকা। সেখানে ওকান্দেদের দেখতে পেলে আর রক্ষা নেই। অগত্যা একটা পাহাড়ে ঢিপির পাশে ছোট একটা কুঁড়ে গোছের তৈরি করিয়ে তারই মধ্যে বেশীর ভাগ সঙ্গের জিনিস রাখলাম। তারপর নিতান্ত দরকারী জিনিসপত্র একটা ছোট ব্যাগে ভরে রওনা হলাম রেনে লাভালের ডেরা খুঁজতে। সামনে ছোটখাটো একটা পাহাড় হাজার চারেক ফুট উঁচু। তারই মাঝামাঝি একটা পাহাড়ের খাঁজে লাভালের আস্তানা লুকোনো বলে নির্দেশ পেয়েছি।

অচেনা পাহাড় বেয়ে উঠে সে আস্তানা খুঁজে বার করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। পাহাড়ের দুটো শাখার মাঝখানে এমন ভাবে আস্তানাটা লুকোনো যে, সহজে চোখে পড়বার কথা নয়।

আস্তানা বলতে তিনটি ছোট বড় জঙ্গলের কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ঘর। বড়টি ল্যাবরেটরি আর দুটি শোবার ও রান্নার। কিন্তু তিনটি ঘরের কোথাও কেউ নেই। ঘর-দোরের চেহারা দেখলে মনে হয়, অন্তত দু-একদিন আগেও সেখানে কেউ না কেউ ছিল। রান্নাঘরে একটা স্টোভের ওপর একটা জলভরা কেটলি চাপানো। পাশের টেবিলে একটা ডিশের ওপর একটা বাসি অমলেট ভাজা পড়ে আছে। কেউ যেন অমলেট ভাজা সেরে চায়ের জল কেটলিতে চড়িয়ে হঠাৎ চলে গেছে। কেটলিটা নামিয়ে স্টোভটা নেড়ে দেখে বুঝলাম তেল ফুরিয়েই সেটা শেষ পর্যন্ত নিভে গেছে।

কেটলির জলও ফুটে ফুটে অর্ধেক হয়ে যে আগুন নেভবার পর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, ভেতরে কেটলির গায়ে পরপর জলের গোল গোল দাগেই তা বোঝা গেল।

এটা যে লাভালের আস্তানা, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি-সরঞ্জাম দেখেই তা ধরা যায়। কিন্তু লাভাল গেছে কোথায়? হঠাৎ অমন করে গেছেই বা কেন?

কোন শত্রু তাকে এখানে আক্রমণ করেছিল বলেও মনে হল না। সেরকম কোন চিহ্ন কোথাও নেই। ল্যাবরেটরি থেকে ঘরদোরের জিনিস-পত্র সব কেউ ছুঁয়েছে বলেও মনে হল না।

আমার সন্দেহ হয়তো অমূলক। লাভাল হয়তো কাছেই কোথাও গেছে। এখুনি ফিরে আসবে ভেবে অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। কিন্তু বৃথাই।

এত রাত্রে আর খুঁজতে যাওয়ার কোন মানে হয় না। ওই আস্তানাতেই রাতটা কাটাবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, এমন সময় নিস্তব্ধ পাহাড়ে কোথায় যেন একটা পাথর খসে পড়বার শব্দ পেলাম। তারপর বুঝতে পারলাম পাহাড়ের খাড়াই পথে এই আস্তানার দিকে কে যেন সন্তর্পণে আসছে। পাহাড়ী রাস্তার আলগা নুড়ি পাথর নড়াচড়ার শব্দ একটু ভাল করে কান পাতলেই শোনা যায়।

কোনো জানোয়ার-টানোয়ার হবে কি? না, তা হওয়া সম্ভব নয়। এখানে সিংহ নেই বললেই হয়। আর সিংহ কি জংলী চিতা মানুষের ব্যবহার করা পথে পারতপক্ষে আসবে না।

রাতটা খুব অন্ধকার নয়। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ খানিক আগে পাহাড়ের ওপারে উঠতে শুরু করছে। তেলের অভাবে আলো-টালো এতক্ষণ জ্বালতে না পারলেও খুব অসুবিধে হয়নি। এখন মনে হল, তেল না থেকে ভালই হয়েছে। যে আসছে, সে লাভাল নিশ্চয়ই নয়। কারণ, তা হলে নিজের

আস্তানায় এত সন্তর্পণে সে আসত না। যেই সে হোক, আস্তানায় আলো থাকলে দেখতে সে পেতোই দূর থেকে। তাতে হয় পালাতো নয় আরো সাবধান হয়ে হানা দিত। তার চেয়ে আধা-অন্ধকারে আমি যে তার জন্যে আগে থাকতে প্রস্তুত থাকতে পারছি এই ভালো।

এক হাতে পিস্তল আর এক হাতে টর্চটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে কাঠের বাড়িটার পিছন দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী কি অষ্টমীর লালচে চাঁদ তখন পাহাড়ের মাথায় আরো খানিকটা উঠে এসেছে। চারিদিকে কেমন একটা ছমছমে ভূতুড়ে আবছা অন্ধকার। আমি যেখানটায় দাঁড়িয়েছিলাম সেখানটায় সেই চাঁদের আলোর ছায়াতেই অন্ধকার আরো গাঢ়।

দেশলাই জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে টর্চটা ফেললাম

চুপিসাড়ে যে পাহাড়ী পথে উঠে আসছিল, একটা পাথুরে ঢিপি ঘুরে আসতেই তার মূর্ত্তিটা অন্তত দেখা গেল।

জানোয়ার নয় মানুষই, আর জংলীও যে নয় ওই আবছা আলোতেই দূর থেকে তার পোশাক দেখেই তা বুঝতে দেরি হল না।

কে তাহলে লোকটা ?

লাভাল যে নয়, মুখ না দেখে শুধু আকৃতি দেখেই বুঝতে পারলাম। লাভাল গোলগাল ছোটখাটো মানুষ। আর এ লোকটা মোটা তো নয়ই, বরং বেশ রোগা ও লম্বা। সন্তর্পণে আসছে বটে, কিন্তু একটা পা বেশ খুঁড়িয়ে।

ঠিক সময় বুঝে ধরব বলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

লোকটা লাভালের আস্তানার সামনে এসে এদিক-ওদিক চেয়ে ভেতরে গিয়ে ঢুকতেই নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে খোলা দরজার বাইরের দিকে দাঁড়ালাম।

লোকটা তখন একটা দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। ড্যাম্প ধরা বলেই বোধহয় কাঠিটা ধরছে না।

দেশলাই জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে টর্চটা ফেললাম।

কে ? বলে আঁতকে উঠে সে যতখানি চমকালো, আমি তার চেয়ে কম নয়। লাভালের আস্তানায় চোরের মত ঢুকেছে আর কেউ নয়, সোলোমাস। সাবাটিনি নিজে শয়তান হলেও সোলোমাস সম্বন্ধে তাহলে মিথ্যে বলেনি !

প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে তখন আমি কর্তব্য স্থির করে ফেলেছি। টর্চের আলোটা তার মুখের ওপর রেখেই ভেতরে ঢুকে পিস্তলটা তার দিকে উঁচিয়ে বললাম—আপনার সব খেল খতম মঁসিয়ে সোলোমাস।

সোলোমাস কিন্তু ভয় পাওয়ার বদলে এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, যেন হাতে চাঁদ পেয়ে,—ওঃ আপনি ! আপনি এসেছেন দাস ! আপনার আশায় কিভাবে যে দিন গুনছি !

কড়া গলায় বললাম—ওসব চালাকি রাখুন সোলোমাস। একবার আমায় আহাম্মক বানিয়েছেন বলে কি বার বার পারবেন ভাবছেন ? আপনার সব শয়তানি আমি জানি। বলুন, কেন লুকিয়ে এখানে এসেছেন ? কোথায় লাভালকে সরিয়েছেন ? সরিয়েছেন, না, শেষ করে দিয়েছেন ?

এ সব আপনি কি বলছেন!—সোলোমাসের গলার স্বর সত্যিই যেন কাতর,—একটু ধৈর্য ধরুন। আমায় আলোটা জ্বালতে দিন, তারপর সব কথা শুনুন।

আমি তখন আর সোলোমাসের অভিনয়ে ভুলতে রাজী নই। কঠোর হয়ে বললাম,—আপনাকে আমি আর বিশ্বাস করি না এতটুকু। তাছাড়া, আলো আপনি জ্বালবেন কিসে? এখানে তেল নেই।

তেল ছাড়া আলো জ্বলবে।—সোলোমাস গম্ভীর গলায় বলে ঘরের একদিকে যেতেই আমি টর্চটা তার ওপর রেখে বললাম,—কোনো চালাকির চেষ্টা করেছেন কি গেছেন। আপনার দোস্ত সাবাটিনির পরিণাম তাহলে আপনার হবে।

সাবাটিনির পরিণাম! তার সঙ্গে তাহলে আপনার দেখা হয়েছে! বলে সোলোমাস অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়ালেন। কোথায় কি একটা টেপায় ঘরের ছাদের একটা গুপ্ত আলো তখন জ্বলে উঠেছে।

সেই গুপ্ত আলোর রহস্যে যেটুকু কৌতূহল হয়েছিল, সোলোমাসের পরের কথায় তা ভুলে গিয়ে একেবারে থ হয়ে গেলাম।

সোলোমাস আগের কথার খেই ধরেই উৎসুক হয়ে বললেন—কখন দেখা হল? আজ? তার কি পরিণামের কথা বলছেন?

এবার আমাকে হতভম্ব হতে হল,—কি বলছেন আপনি? আজ তার সঙ্গে কোথায় দেখা হবে? তাকে শেষ দেখেছি খার্তুমে।

সোলোমাস হতাশভাবে বললেন,—বুঝেছি, তাই আপনি অমন উল্টো-পাল্টা কথা বলছেন। সাবাটিনি যে এখানে, তার জন্যেই যে আমাদের এই সর্বনাশ—এসব আপনি কিছু জানেন না।

সোলোমাসের গলায় সত্যের সুর যতই থাক, সন্দেহ আমার গেল না। কঠিন হয়ে বললাম,—আবার আমায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা করছেন সোলোমাস!

ধোঁকা আপনাকে কোন সময়ই দিই নি দাস!—ক্লান্তভাবে বললেন সোলোমাস,—আপনিই শুধু সাবাটিনির ছোঁয়াচ লেগে সব কিছু বাঁকা দেখছেন। অবিশ্বাস করতে হয় করবেন, কিন্তু তার আগে ধৈর্য ধরে কথাগুলো একটু শুনবেন?

তাই শুনলাম এবার। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

সাবাটিনিকে আমি যতখানি চিনেছিলাম, সে তার চেয়ে অনেক পাকা শয়তান। আমার হাতে ওই লাঞ্ছনাতেও তার কোন মতলবের পরিবর্তন হয় নি। আমার নির্দেশ-দেওয়া চিঠি চুরির মূলে যে সে-ই ছিল, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। সেই নির্দেশ অনুসরণ করে আমার আগেই সে এখানে পৌঁছেছে। সম্ভবতঃ কায়রো যাওয়ার পথে আমার যে দেরিটা হয়েছিল, তাতেই এ সুবিধে সে পেয়েছে। এখানে এসে সে যা চাল চেলেছে, বদমায়েসী বুদ্ধিতে তার তুলনা হয় না। এ অঞ্চলের জংলী অধিবাসী হল ফাঙ্গ বলে এক অসভ্য জাত। সাবাটিনি কূট কৌশলে তাদেরই লাভালের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়েছে। কাছাকাছি নির্জন একটি পাহাড়-ঘেরা জায়গা ফাঙ্গদের পবিত্র দেবস্থান। সেখানকার একটি বিদঘুটে আকারের পাথর তারা পূজো করে। সাবাটিনি সেই পাথরটা চুরি করে সরিয়ে দিয়ে ফাঙ্গদের ওঝা পুরুতদের ঘুষ দিয়ে বা যেভাবে হোক বুঝিয়েছে যে, বিদেশী একটা লোক অন্য দেবতার পূজোর মন্দির বানিয়ে তাদের দেশ অপবিত্র করেছে বলেই ফাঙ্গদের নিজেদের দেবতা তাদের ছেড়ে গেছে। লাভালের ল্যাবরেটরিটাই ফাঙ্গদের দুশমন দেবতার মন্দির বলে সাবাটিনি বুঝিয়েছে। ফাঙ্গরাই একদিন এই ল্যাবরেটরির কাঠের বাড়ি তৈরি করতে ও বহুদূর থেকে সেখানকার যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম বয়ে আনতে সাহায্য করেছিল। এখন সেই ল্যাবরেটরি আর লাভালের ওপরই তারা খাপ্পা। লাভালকে তারা হঠাৎ চড়াও হয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করেছে। আর চার মাস বাদে তাদের নিজেদের দেবতার উৎসবের দিন। সেই দিন এই ল্যাবরেটরিতেই

লাভালকে বলি দিয়ে সমস্ত কিছু তারা পুড়িয়ে দেবে নিজেদের দেবতাকে সন্তুষ্ট করে ফিরিয়ে আনতে। এই তাদের সঙ্কল্প। লাভালকে যেদিন জংলীরা ধরে নিয়ে যায় সোলোমাস তার আগেই এ আস্তানায় পৌঁছলেও জংলীদের হানা দেবার সময় উপস্থিত ছিলেন না। ল্যাবরেটরির জন্যেই কয়েকটা গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করতে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে লাভালের লেখা চিঠি পড়ে তিনি সব বুঝতে পারেন। লাভাল বন্দী হয়ে চলে যাবার আগে ওই চিঠিটুকু লিখে যেতে পেরেছিলেন।

সোলোমাস লাভালের লেখা শেষ চিঠি আমায় দেখালেন। তাতে ক'টি মাত্র কথা তাড়াতাড়িতে পেন্সিল দিয়ে লেখা।

মেলাস, আমি বন্দী। সাবাটিনির ষড়যন্ত্র। ল্যাবরেটরি বাঁচাও।

চিঠি পড়ে আমি জিজ্ঞাসা করলাম,—এ ক'দিন আগের কথা?

পাঁচদিন।—বললেন সোলোমাস—এ পাঁচদিন কি করে যে আমার কেটেছে তা বলতে পারি না। এ আস্তানায় এসে ওই চিঠি পেয়েই আবার পালিয়ে যেতে হয়েছে। কখন জংলীরা আবার আসে কে জানে। ল্যাবরেটরি বাঁচাবার কথা লাভাল লিখে গেছেন। কিন্তু জংলীরা এলে বাঁচাবো কি করে? একলা তাদের বিরুদ্ধে কি করতে পারি? বিশেষ করে সাবাটিনি যখন তাদের মন্ত্রণাদাতা। জংলীরা কিন্তু ল্যাবরেটরি ভাঙতে আসেনি। সেটাও সাবাটিনির পরামর্শে নিশ্চয়। সাবাটিনি তো সত্যিই ল্যাবরেটরি ভাঙতে চায় না। আপাতত জংলীদের সাহায্যে আমাদের জব্দ করে পরে ল্যাবরেটরি শুদ্ধ লাভালকে লোপাট করে নিয়ে যাওয়াই তার মতলব। ফাঙ্গরা চার মাসের পর উৎসবের দিন ল্যাবরেটরির সঙ্গে লাভালকেও শেষ করতে চায় এ খবর তারপর জেনেছি। জেনেছি একটি মাত্র বিশ্বাসী জংলীর কাছে। সে-ই ছিল লাভালের ও আমার একমাত্র সঙ্গী ও অনুচর। আপাতত সে দলের লোকের ভয়ে ল্যাবরেটরিতে আসে না। তবে আমি এখান থেকে দূরে যে পাহাড়ের গুহায় লুকিয়ে আছি,

খোঁজ করে সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করেছে। তার কাছেই সাবাটিনি ও ফাঙ্গদের সমস্ত খবর পেয়েছি। পেয়ে কি করব কিছুই ঠিক করতে না পেরে শুধু আপনার পথ চেয়ে আছি। আপনার দেরি দেখে তো ভয় হচ্ছিল সাবাটিনি আপনাকেও কোনো ভাবে বন্দী-টন্দি করেছে।

একটু চুপ করে থেকে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি যে আলো জ্বাললেন, তাতে কোনো ভয় নেই ?

না।—সোলোমাস আশ্বাস দিলেন—পাহাড়ের খাঁজে এমন ভাবে এ ল্যাবরেটরি লুকানো যে, বাইরে কোথাও থেকে এর আলো দেখা যায় না। তাছাড়া, জংলীরা থাকে এখান থেকে অনেক পশ্চিমে জঙ্গলের মধ্যে 'বোমা'য় ঘেরা গ্রামে। সেখান থেকে রাত্রে তারা রাজত্বের লোভেও বেরুবে না। ভয় শুধু সাবাটিনিকে। কিন্তু সে-ও এখন মতলব হাসিল করে নিশ্চিন্ত মনে পরের চালের ফন্দি আঁটছে। তার রাত্রে এদিকে আসার কোনো দরকারই নেই। আমি যে এখানে এসেছি, তা সে জানে না। আমি তাই প্রতি রাত্রে লুকিয়ে এসে ল্যাবরেটরিটা দেখে শুনে লুকোনো বিদ্যুতের ব্যাটারিগুলো চালু রেখে যাই।

আচ্ছা, লাভাল তো চিঠিটা মেলাস বলে কাকে লিখেছেন।—এবার আমি না বলে পারলাম না।—আপনার নাম অথচ সোলোমাস বলেই জেনেছি।

সোলোমাস একটু দুঃখের হাসি হেসে বললেন,—সন্দেহ দেখছি এখনও আপনার সম্পূর্ণ যায় নি ! শুনুন, মেলাস আমার পদবী। আমার পুরো নাম হল সোলোমাস মেলাস। পরিচয়টা লুকোবার জন্যেই শুধু সোলোমাস নামটা নিয়েছিলাম। লাভাল চিরকাল আমাকে মেলাস বলেই ডাকেন।

একমুহূর্তে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিস্মিত আনন্দে বললাম,—ও, আপনিই তাহলে লাভালের সেই সহকারী, যিনি লাভালের আগেই দেশে যাবার নাম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যান ?

হ্যাঁ, লাভাল ও আমি দুজনে পরামর্শ করেই ওই ব্যবস্থা করেছিলাম। ঠিক হয়েছিল, প্রথমে আমি গা-ঢাকা দেব। তারপর লাভাল। আমার দেশ যে গ্রীস, তা নাম দেখেই নিশ্চয় বুঝেছেন। গ্রীসে যাবার নাম করে দুনিয়ার কেউ কল্পনাও করতে পারে না এমন জায়গা খুঁজে বার করে এখানে ল্যাবরেটরি বসাবার ব্যবস্থা আমিই করি। লাভাল পরে পালিয়ে এসে এখানে ওঠেন। শত্রুদের ধোঁকা দেবার জন্যে আমাকে তারপর বাইরে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিথ্যে যোগাযোগ করতে হয়। শত্রুরা, বিশেষ করে সাবাটিনি যাদের হয়ে কাজ করছে তারা, কিন্তু ক্রমশই আমাদের চারিধারে জালের বেড়া দুর্ভেদ্য করে আনছে বলে ভয় হয়। বড় বড় রাজাগজাদের সাহায্য চাইতে আমরা নারাজ। রক্ষকই তাহলে ভক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। পরামর্শের জন্যে একান্ত বিশ্বাসী বন্ধু হিসেবে লাভাল তাই আপনাকে স্মরণ করেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে আপনাকে ডাকাও বৃথা হয়েছে। লাভালের যুগান্তকারী গবেষণা আর সম্পূর্ণ হবে না।

সোলোমাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করবার পর বললাম,—আমাদের দেশে একটা কথা আছে সোলোমাস, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। সুতরাং আশা ছাড়বেন না। শুধু একটা কথা, আগে আমি জানতে চাই। গবেষণা সত্যি কতদূর এগিয়েছে? পুরো সংখ্যা যে একশো সাঁইত্রিশ সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই তো?

না।

মূলাধার শুধু একটি?

হ্যাঁ।

আর সাজানো কিভাবে?

ওই মাঝের একটি ম্যাগ্‌নেসিয়াম পরমাণুকে ঘিরে পঞ্চান্নটি কার্বন, বাহাত্তরটি হাইড্রোজেন, পাঁচটি অক্সিজেন ও চারটি নাইট্রোজেন পরমাণু।—সোলোমাস বলে গেলেন।

এই সমস্ত পরমাণু মিলিয়ে কৃত্রিম উপায়ে মূল জিনিস তৈরিও করতে পেরেছেন ল্যাবরেটরিতে ?

হ্যাঁ, তা পেরেছি। শুধু জিনিসটা এখনও অসাড় বলা যায়। আসল কাজ ঠিক করছে না। সেই আসল কাজ করাবার গবেষণাই চলেছে। মানে এতদিন পর্যন্ত চলছিল।—বলে সোলোমাস আবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

একটু চুপ করে ভেবে নিয়ে এবার বললাম—আপনাদের বিশ্বাসী জংলীর নাম কি ?

উজি।

উজি মানে তো সোয়াহিলি ভাষায় বুড়ো। লোকটা বুড়ো নাকি ?—জিজ্ঞেস করলাম।

না, বুড়ো নয়। জোয়ান। ওই তার ডাক-নাম।

শুনুন, উজিকে দিয়েই ফাঙ্গদের কাছে খবর পাঠাবেন যে, তাদের মুঙ্গু, মানে দেবতা, এই ক'দিন বাদেই অমাবস্যার রাত্রে তাদের বোমা, মানে, কাঠের দেওয়াল ঘেরা গ্রাম থেকে কিছু দূরে যে টিঙ্গা টিঙ্গা অর্থাৎ জলা আছে, তার ওপারে এক ওকুমে, মানে, আবলুশ কাঠের গাছ থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন।

সোলোমাস হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—এ খবর পাঠাবার মানে ?

মানে, সত্যিই সেদিন তাদের দেবতা ওই ওকুমে গাছ থেকে তাদের জানাবেন যে, যে বিদেশীকে তারা ধরে নিয়ে গেছে, সে দেবতার দস্তুরমত পেয়ারের লোক। তাকে এখুনি ছেড়ে দিয়ে তার ঘর-বাড়ি মন্দির মানে ল্যাবরেটরি যদি তারা নিজেরাই পাহারা দেবার ব্যবস্থা এখন থেকে না করে, তাহলে তিনমাস বাদে কুলো নদীর যে দুটি শাখা তাদের গাঁয়ের দুদিক দিয়ে বয়ে গেছে, তার একটা রক্তে লাল হবে আর একটায় আগুন জ্বলবে।

সোলোমাস আমার দিকে সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে বললেন—এই সব বিপদ দেখেশুনে আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে দাস! ফাঙ্গরা যদি সত্যিই ওই জলার ধারে দেবতার কথা শুনতে যায় তো তারা ওই সব আজগুবি কথা বিশ্বাস করে লাভালকে ছেড়ে দেবে মনে করেন? সাবাটিনি তাদের পেছনে আছে একথা ভুলবেন না। যদি তিন মাস তারা দেবতার কথার প্রমাণ দেখবার জন্যে অপেক্ষা করে?

তাহলে প্রমাণ দেখতে পাবে।—বলে হাসলাম।

সোলোমাস অত্যন্ত ক্ষুণ্ণস্বরে বললেন,—এটা কি ঠাট্টা-ইয়ার্কির সময়, দাস্?

ঠাট্টা-ইয়ার্কি করছি না সোলোমাস। সত্যিই এক নদীতে জল লাল করে আরেক নদীতে আগুন জ্বালব। আপনাদের ল্যাবরেটরিতে সেন্ট্রিফিউজ নিশ্চয় আছে?

আছে।—সোলোমাস তখনও হতভম্ব।

ভালো। আর শুধু ক'টা টেস্টটিউব আর জোরালো বিদ্যুতের আলো হলেই চলবে।

কি চলবে?—সোলোমাস অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।—কি করবেন আপনি?

দুটো নেহাত তুচ্ছ প্রাণীর বংশবৃদ্ধি করাবো।

বংশবৃদ্ধি করাবেন—সোলোমাসের চোখ কপালে উঠল,—কি প্রাণীর?

একটা হল জিম্‌নোডিনিয়াম ব্রিভ, আর একটা নক্টিলুকা মিলারিস্। নেহাত আণুবীক্ষণিক নগণ্য প্রাণের কণা, দুটো সুতোলি চাবুকের মত শুঁড় বার করা একরকম ডাইনো ফ্ল্যাজেলেট্।—হাতের ব্যাগটা খুলে একটা পিপেট বার করে বললাম,—তার জন্যে এই কাঁচের সূক্ষ্ম ছুঁচই যথেষ্ট।

আমি রসায়নের গবেষণা করি, ও সব প্রাণিতত্ত্ব বুঝি না।—বলে

সোলোমাস যে ভাবে হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেলেন, তাতে মনে হল আমার মাথা খারাপ হওয়া সম্বন্ধে কোন সন্দেহ তাঁর আর তখন নেই।

অমাবস্যার আগের দিন পর্যন্ত দিনে সোলোমাসের সঙ্গে তার গোপন গুহায় লুকিয়ে থেকে রাত্রে তাদের ল্যাবরেটরিতে আমি যা করবার করে ফেললাম। তারপর গোপনে উজির হাতে ক'টা দাগ-দেওয়া টেস্টটিউব দিয়ে নদীর কোন্ শাখায় কোন্‌গুলো ফেলতে হবে বলে দিলাম।

অমাবস্যার রাতে টিঙ্গা টিঙ্গার ধারে জংলী ফাঙ্গরা সত্যিই এসে জড় হল মাঝ রাতে! সাবাটিনি তাদের আটকাবার অনেক চেষ্টা অবশ্য করেছিল। উজি বিদেশীদের কাছে কাজ করে বিধর্মীদের চর হয়েছে, জানিয়ে এটা শত্রুদের একটা ফাঁদ বলে বোঝাতে চেয়েছিল। জংলীরা তাতে উজিকে বন্দী করেছিল, কিন্তু কুসংস্কারের কৌতূহলে দল বেঁধে জলার ধারে আসতেও ছাড়ে নি।

জলার ওপারে ওকুমে গাছ থেকে দেবতার আদেশ শুনে ভড়কে গেলেও তারা লাভালকে কিন্তু ছেড়ে দিল না। সাবাটিনির উস্কানিতে তারা তিন মাস বাদে প্রমাণের জন্যে অপেক্ষা করে রইল।

সে তিন মাস কি উদ্বেগের মধ্যে যে কাটল, তা বলে বোঝান যাবে না। সোলোমাস তো আমার ওপর তখন ক্ষেপেই গেছেন। ল্যাবরেটরিটা বাঁচাবার যেটুকু আশা ছিল, আমি যেন পাগলামি করে তা জলাঞ্জলি দিয়েছি।

তিনমাস বাদে জংলীরাও যেমন প্রতিদিন নদীর দুই শাখার ওপর নজর রাখে, আমিও গোপনে গোপনে তাই।

তারপর হঠাৎ একদিন জংলীদের সে কি তাণ্ডব নৃত্য। গ্রামকে গ্রাম জুড়ে ঙগোমা মানে উৎসবের নাচ শুরু হয়ে গেল। একটা নদীর জল সত্যিই রক্তের মত লাল হয়ে উঠেছে, আরেকটা আগুনের মত জ্বলছে।

আপনার ওই ছুঁচ ফুটিয়েই একটা নদী থেকে রক্ত বার করে আরেকটায় আগুন ধরালেন!—শিবু কাশতে কাশতে বলল।

হ্যাঁ, আমার ব্যাগে ছিল সমুদ্রের জ্যান্ত অ্যানিমোনের টুকরো, তুজাতের ডাইনো ফ্ল্যাজেলেটে ভরতি। পুয়ের্তোরিকো থেকে এনেছিলাম নক্টিলিউকা মিলিয়ারিসের জীবাণু, সেখানকার নদী সমুদ্রের মোহানায় যাতে মাঝে মাঝে জল আগুনের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে আর যাকে জিম্ ব্রিভ বলে জেলেরা সেই জল লাল করা মাছের মড়ক লাগানো জিম্নোডিনিয়াম ব্রিভ-এর জীবাণু এনেছিলাম ফ্লোরিডা থেকে। সেন্ট্রি ফিউজে অ্যানিমোনের টুকরোগুলো পাক খাইয়ে ছেত্‌রে আলাদা করে তা থেকে অতি সূক্ষ্ম ছুঁচের মত পিপেট দিয়ে এক একটি আলাদা জীবাণু তুলে তাদের আহার মেশানো টেস্টটিউবের ভেতর ছেড়ে উজ্জ্বল ইলেকট্রিক বাতির তলায় রেখে দিয়েছিলাম। সেই ইলেকট্রিক আলোই সূর্যের কাজ করছিল। জীবাণুগুলো লক্ষ লক্ষ গুণ তাতে বেড়ে উঠেছিল। তারপর সেই টেস্টটিউবের জীবাণু নদীর শাখায় ফেলবার পর তিনমাসে উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে অসম্ভব বেড়ে একদিন জলকে লাল আর আগুন করে তুলেছিল। ফ্লোরিডায় আর পুয়ের্তোরিকোয় এই ব্যাপার প্রায়ই ঘটে। সাধারণত এক পাঁইট জলে যে জীবাণু পাঁচশোর বেশী থাকে না, ঠিক প্রশ্রয় পেলে তা তিন কোটি হয়ে দাঁড়ায়।

লাভালকে তাহলে জংলীরা ছেড়ে দিল!—আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।

তা আর দেবে না! ছেড়ে শুধু নয় সে তো ছোটখাট দেবতা হয়ে উঠল তারপর। তাকে বা তার ল্যাবরেটরিকে ছোঁয় কার সাধ্য!

আর সাবাটিনি?

সাবাটিনিকে দেবতার রাগের প্রমাণ পাবার পর তারা ধরে বেঁধে ফেলেছিল। তাকে প্রাণে মারতে বারণ করেছিলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে বলে দিয়েছিলাম টিঙ্গা টিঙ্গার ধারের ওকুমে গাছ থেকে, যে, তাকে পালাতে দিলেই দেবতা আবার ক্ষেপে যাবেন। সাবাটিনি ওই ফাঙ্গাদের কাছেই বন্দী হয়ে আছে।

কিন্তু এত কাণ্ড যার জন্যে, লাভালের সেই গবেষণার বস্তুটা কি!

জিজ্ঞেস করে মনে হল আসল কাজ যখন হাসিল হয়েছে, তখন প্রশ্নটা করে ঘনাদাকে ফাঁপরে ফেলার আর দরকার ছিল না।

ঘনাদা কিন্তু মোটেই ভড়কালেন না। আমাদের দিকে করুণাভরে তাকিয়ে বললেন,—তাও এতক্ষণ বুঝতে পারোনি? বস্তুটা হল ক্লোরোফিল। গাছপালা থেকে সমুদ্রের সূক্ষ্ম প্ল্যাংকটন পর্যন্ত যার দৌলতে সূর্যের আলো রাহাজানি করে প্রাণী-জগতের খাদ্যের ভিৎ তৈরি করে, যা না থাকলে পৃথিবীতে মানুষ তো দূরের কথা প্রাণের অস্তিত্বই থাকত না, সেই ক্লোরোফিল কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করবার চেষ্টা নানা দেশের বৈজ্ঞানিকরা করছেন। কিন্তু সে ক্লোরোফিল আসলের সঙ্গে সব দিক দিয়ে মিললেও এখনো আসল কাজ, মানে সূর্যের আলোর 'কোয়ান্টা' ধ'রে কার্বন-ডায়োক্সাইডকে কার্বোহাইড্রেট করে তুলতে পারছে না জলের হাইড্রোজেনটুকু নিয়ে অক্সিজেন মুক্ত করে দিয়ে। লাভাল সেই গবেষণাতেই অন্যদের চেয়ে অনেক দূর এগিয়েছেন। সত্যিকার ক্লোরোফিল একবার কৃত্রিম উপায়ে তৈরি হলে পৃথিবীতে অন্নাভাব বলে আর কিছু থাকবে না, মরুভূমির মাঝখানে থেকেও মানুষ নকল ক্লোরোফিল দিয়ে যত খুশি যা ইচ্ছে খাবারের মশলা তৈরি করতে পারবে।

আমাদের স্বল্পাহার ব্রতটা তাহলে—শিবু কথাটা শুরু করতেই ঘনাদা শিশিরের সিগারেটের টিনটা ভুলে পকেটে ভরে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, —তার আর দরকার হবে বলে মনে হচ্ছে না। লাভালের কাছ থেকে খবর এল বলে।

আপনাকে চুরি !—প্রায় কেলেঙ্কারিই করে ফেলেছিলাম বেফাঁস কথাটার সঙ্গে কাশি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে। তাড়াতাড়ি সামলে বললাম,—এত বড় সাহস !

ঘনাদা ঠাণ্ডা হয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সাহস নয়, দায় !

ব্যাপারটা যে বাহাত্তর নম্বর বনমালী নস্কর লেনের তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গোড়া থেকে শুরু করাই নিশ্চয় উচিত।

ফন্দিটা মাথায় এসেছিল গৌরের। আমরা সবাই সেটায় যোগান দিয়েছি মাত্র।

কিন্তু শেষে নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়ে জব্দ হ'ব কে জানত !

সব দিক বেঁধে-ছেঁদেই ব্যবস্থা করেছিলাম কিন্তু কোথায় যে ছিদ্রটুকু ছিল আগে ধরতে পারিনি।

শিবু দামী কার্ডটা ছাপিয়ে এনেছে, তার আগে ঘনাদার দিবানিদ্রার সুযোগে আমরা ক'জনে মিলে চিঠিটার ভাষার খসড়া করেছি অনেক মাথা ঘামিয়ে।

সুবিধে ছিল এই যে সে সময়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস হচ্ছে কলকাতাতেই। দেশ-বিদেশের বড় বড় সব বিজ্ঞানের রথী মহারথীরা এসেছেন এই শহরে। যেন তাঁদেরই একজনের নাম দিয়ে কার্ডটা ছাপান। ভূগোলবিশারদ নামকরা মানচিত্রকার মঁসিয়ে সুস্তেল যেন পৃথিবীর অজ্ঞাত দুর্গমতম স্থানের অদ্বিতীয় আবিষ্কারক ও পর্যটক ঘনশ্যাম দাস এই কলকাতা শহরেই সশরীরে উপস্থিত এই আশাতীত খবর পেয়ে আহ্লাদে গদগদ হয়ে তাঁকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক বিশেষ ভূগোল-বৈঠকে উপস্থিত দেশ-বিদেশের সুধীমণ্ডলীকে তাঁর ভাষণ শুনিয়ে কৃতার্থ করবার জন্যে বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন। কবে ও

কখন তিনি স্বয়ং গাড়ি নিয়ে ঘনশ্যাম দাসকে নিতে আসবেন তাও এ অনুরোধের চিঠিতে জানানো আছে।

আগে থাকতে মহলা দিয়ে যেমন যেমন ঠিক করে রাখা গিয়েছিল ঠিক সেইমতই প্রথম অভিনয় সবাই করেছি। বসবার ঘরের মার্কামারা আরাম-কেদারায় ঘনাদা এসে গা এলিয়ে বসবামাত্র শিশির যথারীতি তার সিগারেটের টিন সামনে খুলে ধরেছে। আমি লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছি সসম্ভ্রমে। ঘনাদা প্রথম টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শিশিরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন,— কত হ'ল ?

বেশী নয়, এই চার হাজার দু'শ' একুশ মাত্র !—শিশির জানিয়েছে সংকুচিতভাবে।

একুশ কেন হবে, উনিশ না ?—ঘনাদার ভ্রূ কুঞ্চিত হতে না হতে শিশির তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বার করে খুলে দেখে লজ্জায় জিভ কেটেছে।—হ্যাঁ হ্যাঁ উনিশ-ই তো !

ঘনাদা সন্তুষ্ট হয়ে আর একটি টান দিয়ে চোখ দু'টি প্রায় নিমীলিত করার পরই আমি আনন্দে যেন কথাটা চাপতে না পেরে বলেছি,—আমরা কিন্তু সবাই শুনতে যাচ্ছি সেদিন ঘনাদা !

সবাই শুনতে যাচ্ছ !—ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়েছেন।—কি শুনতে ?

বাঃ আপনার বক্তৃতা !—আমি যেন ঘনাদার বিস্মৃতিতে অবাক হয়েছি।

ঘনাদা দন্তস্ফুট করার আগেই শিশির সোৎসাহে বলে উঠেছে,—একেবারে ভোরবেলা থেকে 'কিউ' দিতে হবে কিন্তু। নইলে জায়গা মিলবে না।

ভোরবেলা থেকে কি !—শিবু শিশিরকে ধমকেছে,—আগের রাত্তির থেকে বল্ ! মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের শীল্ড্ ফাইন্যাল হার মেনে যাবে দেখিস্। সায়েন্স কংগ্রেসে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা না হয়ে যায় না !

ঘন ঘন সিগারেট টানা আর চোখ-মুখের ভাব দেখেই ঘনাদার অবস্থাটা

বুঝতে পারা গেছে তখন। নেহাত মানের দায়েই সোজাসুজি রহস্যটা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে আর পারেননি। যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে নিজের চাল বজায় রেখে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন,—সায়েন্স কংগ্রেসে আমি বক্তৃতা দিচ্ছি, তোমরা জানলে কোথা থেকে ?

কোথা থেকে জানলাম!—আমরা সমস্বরে নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছি।

শিবু বিশদ ব্যাখ্যার ভার নিয়েছে,—শহরে কে না জানে! তবে মঁসিয়ে সুস্তেল নিজে সব আয়োজন করেছেন আর নিজেই যে তিনি আসছেন আপনাকে নিয়ে যেতে এটা অবশ্য সবাই জানে না।

ঘনাদার মুখে আশানুরূপ আশঙ্কার ছায়া দেখে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছি।

ঘনাদা অস্বস্তিটা বিরক্তির ছলে প্রকাশ করেছেন,—হুঁঃ মঁসিয়ে সুস্তেল বলে তো আমার গুরুঠাকুর নয়! তিনি এসে ধরলেই আমায় যেতে হবে! সায়েন্স কংগ্রেসে বক্তৃতা দেবার জন্যে আমি হেদিয়ে মরছি না কি ?

কি যে বলেন ঘনাদা!—শিশির সমস্ত সায়েন্স কংগ্রেসের হয়ে যেন ঘনাদার রাগ ভাঙাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে,—আপনি হেদিয়ে মরবেন কি, হেদিয়ে মরছে তো তারা! এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা কি তারা জানে না। নইলে মঁসিয়ে সুস্তেল নিজে বাড়ি বয়ে এসে আপনাকে নিমন্ত্রণের চিঠি দিয়ে যান!

নিমন্ত্রণের চিঠি! কি চিঠি?—ঘনাদা সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছেন।

আমরাও একেবারে যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—সে কি! নিমন্ত্রণের চিঠি আপনি দেখেননি ? আপনি তখন বিকেলে লেক-এ বেড়াতে গেছেন। মঁসিয়ে সুস্তেল কত খোঁজ করে এসে কতক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আমাদের কাছে চিঠিটা দিয়ে দেখা না হওয়ার জন্যে কত দুঃখু করে গেলেন।

বার বার করে বলে গেলেন যে আপনাকে নিতে তিনি নিজেই পরশু মানে শনিবার বিকেল চারটেতে আসছেন! সে চিঠি—সে চিঠি, হ্যাঁ গৌরই তো চিঠিটা রাখলে আপনাকে দেবার জন্যে!

আমরা যেন রেগে আগুন হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসে গৌরের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছি তারপর। গৌরও শশব্যস্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বিরক্তির ভান করেছে,—কি ব্যাপার কি! হঠাৎ এত চেঁচামেচি কিসের!

চেঁচামেচি কিসের!—আমরা গৌরকে গালাগাল দিতে আর বাকি রাখিনি—আহাম্মক, অকর্মার ধাড়ি কোথাকার! কলকাতা শহরের মুখে চুনকালি দিয়ে সায়েন্স কংগ্রেসকে তুমি ডোবাতে বসেছ! মঁসিয়ে সুস্তেলের সে চিঠি তুমি ঘনাদাকে দাওনি!

গৌর লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়া চোরের মত মুখ কাঁচুমাচু করে ঘর থেকে কার্ডটি এনে ভয়ে ভয়ে ঘনাদার হাতে দিয়ে বলেছে—মাপ করবেন ঘনাদা। একেবারে মনে ছিল না।

তাচ্ছিল্যভরে কার্ডটা ধরলেও ঘনাদার চোখ দেখে বোঝা গেছে কি মনোযোগ দিয়ে কার্ডটা তিনি পড়েছেন।

কার্ডে কোন খুঁত যে নেই তা আমাদের জানা, ঘনাদাও নিশ্চয় ধরতে পারেননি।

ভেতরে যাই হোক বাইরে ঠাট বজায় রেখে একটু অবজ্ঞার সুরে বলেছেন —সুস্তেল! দাঁড়াও দাঁড়াও, কোন্ সুস্তেল ঠিক মনে পড়ছে না!

বাঃ—মঁসিয়ে সুস্তেলকে মনে পড়ছে না!—শিশির ঘনাদার স্মৃতিশক্তিকে একটু উস্কে দেবার চেষ্টা করেছে—সেই বিখ্যাত কার্টোগ্রাফার, মানে মানচিত্রের ব্যাপারে দুনিয়ায় যাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়।

হুঁঃ—সংক্ষিপ্ত একটি ধ্বনিতে যা বোঝাবার বুঝিয়ে ঘনাদা ঘর থেকে উঠে গেছেন।

তারপর শনিবার দিন সকাল থেকেই আমরা সজাগ। আধা নয়, সে শনিবার কিসের যেন একটা পুরো ছুটি ছিল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত কিছু যে হবে না তা জানতাম। কারণ ছুটির দিন বলে সকালে বাজারটা একটু ভালোরকম করা হয়েছে। মাছের থলের বড় বড় গলদা চিংড়িগুলো ঘনাদাকে কায়দা করে দেখিয়ে রাখতে ভুলিনি।

বেলা একটা নাগাদ ভূরিভোজ শেষ হবার পরই আমাদের সজাগ থাকার সময়।

এবারের সজাগ থাকা একটু অবশ্য আলাদা ধরনের। ঘনাদা পাছে পালিয়ে যান সেই ভয়ে পাহারা দেওয়া নয়, তিনি কোন্ ফাঁকে কি ভাবে মেস থেকে সরে পড়েন, নিজেরা গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে তাই দেখে মজা করা।

দুপুরের খাওয়ার সময়ই জমি তৈরি করে রাখা হয়েছে। ভরপেট খেয়ে আমাদের সকলেরই যেন ঘুমে চোখের পাতা জুড়ে আসছে। ছুটির দিন বলে সেদিন আর তাই খেলাধুলো আড্ডা নয়, যে যার বিছানায় পড়ে ঘুম—এই কথাটাই জানিয়ে রেখেছি।

কিন্তু বিছানায় কতক্ষণ মটকা মেরে শুয়ে থাকা যায়! একটার পর দুটো বাজল। দুটোর পর তিনটে। ঘনাদা এখনো করছেন কি! ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। কান খাড়া করে আছি ঘনাদার পায়ের শব্দের জন্যে। পালা করে জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে তেতলা থেকে নামবার সিঁড়িটার ওপর চোখও রাখছি, কিন্তু ঘনাদার কোন সাড়াশব্দই নেই।

তিনটের পর চারটে বাজল। ঘনাদা কি সত্যিই ছাদ ডিঙিয়ে পালালেন! কিন্তু সেদিকেও তো আমাদের রামভুজকে পাহারায় রেখেছি, ঘনাদার সে রকম কোন চেষ্টা দেখলেই নিচে থেকে 'রামা হো' বলে গান ধরবে। তাহলে? ঘনাদা কি সত্যিই অন্তর্ধানমন্ত্র গোছের কিছু জানেন না কি!

ঘনাদার ঘরের দিকেই একবার খোঁজ করে আসব কিনা ভাবছি এমন সময়ে সশব্দে তাঁর ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর তেতলার

সিঁড়ির ওপর থেকে তাঁর পাড়া-কাঁপানো ডাক—কই হে! সব গেলে কোথায়! দিনের বেলা আর কত ঘুমোবে!

এ ওর মুখের দিকে তাকালাম ফ্যাল ফ্যাল করে। শেষে ঘনাদাই আমাদের খুঁজছেন নিজে থেকে!

ঘনাদার ডাক না শুনে উপায় কি! গুটি গুটি একে একে ভিজে বেড়ালের মত তাঁর তেতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

শিবু ওরই মধ্যে একটু নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা করে বললে,—আপনি এখনো তৈরী হ'ননি ঘনাদা! চারটের সময়ে না আপনাকে নিয়ে যাবার কথা!

নিজের আধময়লা ফতুয়া আর ধুতিটার দিকে একবার চেয়ে বিছানার মাঝখানটিতে উঠে বসে ঘনাদা অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললেন,—আর কি তৈরি হব! কেন, এই সাজে যাওয়া যাবে না?

বাধ্য হয়ে এ বিদ্রূপও হজম করতে হল। শিবু আর একবার ন্যাকা সেজে মান বাঁচাবার চেষ্টা করলে,—মঁসিয়ে সুস্তেল-এর না আসাটা কিন্তু আশ্চর্য!

ঘনাদা একটু হাসলেন এবার। অবজ্ঞাভরে বললেন,—সুস্তেল যে আসবে না আমি জানতাম!

আপনি জানতেন!—বেশ সন্ত্রস্ত হয়েই আমরা ঘনাদার দিকে তাকালাম। কিন্তু যা ভয় করছিলাম ঘনাদা সেদিক দিয়ে গেলেন না। শিশিরের দিকে তর্জনী ও মধ্যম আঙুল ফাঁক করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অনুকম্পার সুরে বললেন,—হ্যাঁ জানতাম। আমি ছিলাম না জেনেই সেদিন এসেছিল, নইলে আমার সামনে এসে দাঁড়াবার ওর সাহস নেই।

পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সাগ্রহে এবার উস্কানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, —কেন বলুন তো? অমন পৃথিবীজোড়া নাম, অতবড় কার্টোগ্রাফার!

হুঁঃ, কার্টোগ্রাফার! ঘনাদা নাসিকাধ্বনি করলেন।

শিশির তৈরী হয়েই এসেছিল। ততক্ষণে ঘনাদার আঙুলের ফাঁকে যথারীতি সিগারেট বসিয়ে দিয়ে দেশলাইএর কাটি জ্বেলে ফেলেছে।

ঘনাদা প্রথম টানটি দিয়ে খানিক চুপ করে থেকে ধোঁয়া ছাড়লেন। আমরা চাতকের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘনাদার শ্রীমুখ থেকে কি শুধু ধোঁয়াই বেরুবে ?

ধৈর্য ধরতে না পেরে শিবু একটু ঝাঁকুনি দেবার চেষ্টা করলে,—সত্যি কার্টোগ্রাফার নয় বুঝি ? জাল ?

জাল হবে কেন !—ঘনাদা মৃদু ধমক দিলেন,—আসল কার্টোগ্রাফারই বটে।. কিন্তু তাতে হয়েছে কি ? নাম-ই গালভরা, আসলে জরিপদারের জেঠা ছাড়া তো কিছু নয়। বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতেরই খবর রাখে। জানে কি 'সোহ্ম অ্যাবিস্যাল প্লে-ন' কোথায় আর কতখানি, মেপেছে কখনো 'মুইর' কি 'প্লেটো সি-মাউণ্ট' কত উঁচু ?

অভিভূতের মত বললাম,—মঙ্গলগ্রহের ভূগোলে আছে বুঝি ? নামও তো কখনো শুনিনি !

ঘনাদা অনুকম্পার হাসি হাসলেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলই কি জানত ! ডোবার পুঁটি হয়ে গেছল সমুদ্রের তিমির সঙ্গে ফচকেমি করতে ! ওই একটি শিশিতেই বাছাধন কুপোকাত।

তক্তপোশের ওপর থেকেই হাত বাড়িয়ে পেছনের শেল্‌ফ থেকে যে শিশিটি তুলে ঘনাদা আমাদের এবার দেখালেন তাতে আমরা-ও থ'।

ওই শিশি ! ওটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের না ?

শিবুর অসাবধান মুখ এক মুহূর্তের জন্যে ফস্‌কে গিয়ে প্রায় ঘাটে এসে ভরাডুবি হয়েছিল আর কি !

হোমিওপ্যাথিক !—ঘনাদা প্রায় ফেটে পড়ছিলেন, শিবুই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—মানে প্রায় সেইরকম দেখতে কিনা। বোকা লোকেরা তফাত ধরতেই পারবে না।

ঘনাদা ফণা নামালেন, একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললেন,—তোমাদের ওই সুস্তেলও পারেনি। সাত সাগর খুঁজে নারবরো দ্বীপে আমায় চুরি করতে আসবার সময় এ অন্ততঃ জানত না, যে এই শিশির মধ্যে তাদের পরমায়ু লুকোন থাকবে!

আপনাকে চুরি!—হাসি চাপতে গিয়ে বিষম খেয়ে প্রায় যাই আর কি! অতিকষ্টে সেটা সামলে ও কেলেঙ্কারি বাঁচিয়ে বললাম,—এত বড় সাহস!

সাহস নয়, দায়।—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি দেখা গেল। আমাদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন,—নারবরো দ্বীপের নাম নিশ্চয় শোননি, গ্যালাপ্যাগোসের নামই হয়ত জানো না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ইকোয়েডর থেকে প্রায় ছ'শো পঞ্চাশ মাইল দূরের এই ক'টি ছোট-বড় আগ্নেয়দ্বীপের জটলায় প্রায় সওয়া এক শতাব্দী আগে সেকালের একটি পালতোলা জাহাজ টহল না দিতে গেলে বিজ্ঞানের এ যুগের সবচেয়ে একটা দামী মতবাদের জন্মই হ'ত কিনা সন্দেহ। সে পালতোলা জাহাজের নাম এচ. এস. এম. বীগ্‌ল্‌, সে জাহাজের বৈজ্ঞানিকের নাম চার্লস ডারউইন, আর সে মতবাদ হ'ল বিবর্তনবাদ।

গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল অ্যালবেমার্ল বা ইসাবেলা। দেখতে খানিকটা ইংরিজী জে হরফের মত। সেই ইসাবেলার মাথার বাঁ দিকে একটি বড় ফুটকি হ'ল নারবরো দ্বীপ, ফার্নানডিনা-ও বলে কেউ কেউ। পৃথিবীর একমাত্র সামুদ্রিক গিরগিটির জাত সি-ইগুয়ানা-র ভালো করে পরিচয় নিতে সেই দ্বীপে তখন কিছুদিনের জন্যে ডেরা বেঁধেছি। পেরুর লিমা থেকে একটি ছোট স্টিমার আমাকে আর আমার এক অনুচর নিমারাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মাসখানেক বাদে আবার সেই স্টিমারই আমাদের নিয়ে যাবে।

আমার অনুচরটি ইকোয়েডরের আদিবাসীর জাত। এমনিতে কাজকর্মে চৌকশ কিন্তু একেবারে ভীতুর শেষ। একে এই জনমানবহীন পাথুরে দ্বীপ,

তার ওপর চারদিকের বালির চড়ায় বিদঘুটে চেহারার ইগুয়ানারা গিজগিজ করছে সারাক্ষণ। দু'দিন যেতেই নিমারার ভয়ে প্রায় নাড়ি-ছাড়ার অবস্থা। সে ধর্মে খ্রীষ্টান। তার ধারণা কোনো অজানা পাপের শাস্তিতে বেঁচে থাকতেই সে নরকে পৌঁছে গেছে।

আমি যত তাকে বোঝাই যে দেখতে ভয়ংকর হলে কি হয় এ দ্বীপের ওই সব প্রাণী একেবারে নিরীহ, মানুষকে পর্যন্ত তারা ভয় করতে শেখেনি, আর লড়াই-এর পাঁয়তাড়া কষলেও নিজেদের মধ্যেও রক্তারক্তি মারামারি কখনো করে না, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। রাত্রে সে ভালো করে ঘুমোয় না পর্যন্ত। তার বিশ্বাস চোখের দু'পাতা এক করলেই সাক্ষাৎ শয়তানের ওসব দূত চুপিচুপি হানা দিয়ে তাঁবু সুদ্ধ আমাদের চিবিয়ে শেষ করে দেবে।

নিমারার অবস্থা দেখে বেশ একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। খাওয়া নেই ঘুম নেই, লোকটা শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবে নাকি! সঙ্গে যে ক্ষুদে ওয়্যারলেস ট্র্যান্‌স্‌মিটারটি ছিল তাই দিয়ে লিমাতে যেদিন স্টিমারটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্যে খবর দিয়েছি সেই রাত্রেই নিমারা একেবারে ক্ষেপে গেছে মনে হ'ল।

সারাদিনের ঘোরাফেরার পর ক্লান্ত শরীরে সবে তখন খাওয়াদাওয়া সেরে একটু ঘুমিয়েছি হঠাৎ নিমারা হুড়মুড় করে তাঁবুর দড়িদড়া প্রায় ছিঁড়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার একেবারে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

বাঁচান, হুজুর বাঁচান!

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে প্রথমটা তো তাকে একটি চড় কষাতেই যাচ্ছিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম রেগে—কি হয়েছে কি!

এবার শয়তান নিজেই এসেছে হুজুর। আর রক্ষে নেই!

রক্ষে যদি নেই জানিস তো আমার ঘুম ভাঙালি কেন হতভাগা!—বিছানা থেকে উঠে পড়ে বললাম,—কই কোথায় তোর শয়তান, দেখাবি চল।

নিমারা সহজে কি যেতে চায়। শয়তানকে একবার সে দেখে এসেছে,

আর একবার সামনে গেলেই তার দফা রফা এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।

কোনরকমে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার ভীত ইশারায় যা দেখলাম তাতে আমারও চক্ষুস্থির।

নারবরো দ্বীপের মাঝখানে মরা আগ্নেয়গিরির প্রায় চূড়ার কাছে আমাদের তাঁবু খাটান হয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চারদিকের সমুদ্রে যেন গাঢ় নীল কালি গোলা! সেই গাঢ় নীলকৃষ্ণ সমুদ্রের জলে নারবরো আর ইসাবেলা দ্বীপের মাঝখানের সংকীর্ণ প্রণালীতে বিরাট কি একটা জলজন্তু ভাসছে দেখতে পেলাম। সেটাকে সবচেয়ে বড় জাতের নীল তিমি বা সিবাল্ড'স্ ররকোয়াল ভাবতে পারতাম, কিন্তু নীল তিমিও তো ছেষট্টি সাতষট্টি হাতের বেশী লম্বায় কখনো হয় না। তা ছাড়া নীল তিমির গা থেকে থেকে-থেকে এরকম আলো ঠিকরে বেরোয় বলে তো কখনো শুনিনি। গ্যালাপ্যাগোসের সবই অদ্ভুত। অতল সমুদ্রের কোনো অজানা বিরাট বিভীষিকাই আমার দেখবার সৌভাগ্য হল নাকি?

দেখতে দেখতে বিরাট জলজন্তুটা সমুদ্রে ডুবে গেল। নিমারা তখন আর দাঁড়াতে না পেরে বসে পড়ে দু'হাতে মুখ ঢেকেছে।

তাকে ধমক দিয়ে বললাম,—অত ভয়ের কি আছে। তোমার শয়তান তো সমুদ্র থেকে ডাঙায় ওঠেনি। তাছাড়া নিজেই সে ভয়ে ডুব মেরেছে চেয়ে দেখো।

চোখ না খুলেই নিমারা বললে,—না হুজুর, ও শুধু শয়তানের ছল। এখন ডুব দিয়েছে কিন্তু দেখবেন ঠিক আবার অন্য মূর্তিতে এসে হাজির হবে।

নিমারার কথাই এক দিক দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে তার পরদিন ফলল বলা যায়!

রাত্রে-দেখা সেই অজানা বিশাল জলচরের কথা মাথায় থাকলেও, রোজকার মত সকালে বেরিয়ে ক্যামেরায় ক'টি অদ্ভুত প্রাণী ও দৃশ্যের ছবি তখন তুলেছি। নারবরো দ্বীপে হিংস্র প্রাণী একেবারে নেই বলা ঠিক নয়। একধরনের সাপই এই অহিংসার রাজ্যের কলঙ্ক। একটা ফণিমনসা জাতের অদ্ভুত গাছের ঝোপে সেই সাপের একটি বড় গিরগিটি ধরে খাওয়ার ছবি তন্ময় হয়ে তুলছি, এমন সময় পিঠে একটা খোঁচা খেয়ে চমকে উঠলাম।

নিমারার অবস্থা কাহিল। তাকে তাঁবুতেই রেখে এসেছি শুইয়ে। সুতরাং হঠাৎ একেবারে ক্ষেপে গেলেও সে এমন চুপি চুপি এসে আমার পিঠে নিশ্চয় খোঁচা দেবে না। তাহলে এই জনমানবহীন দ্বীপে কে এসে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে খোঁচা দিয়েছে!

বলতে এতক্ষণ লাগলেও পলকের মধ্যে এসব ভাবনা বিদ্যুতের মত মাথার মধ্যে খেলে গেল। তারপর পেছন ফিরতে যাচ্ছি পিঠে আরো জোরে একটা খোঁচার সঙ্গে ভারী গম্ভীর গলার শাসানি শুনতে পেলাম—ফেরবার চেষ্টা কোরো না, যেমন আছ সেইভাবে এগিয়ে চলো। তোমার পিঠে দোনলা বন্দুক ঠেকানো তা বোধ হয় বুঝেছ।

শুধু ওইটুকুই নয়, আরো অনেক কিছুই তখন বুঝে ফেলেছি। কথাগুলো ফরাসীতে বলা হলেও তাতে একটু বাঁকা টান। আলজিরিয়া কি মরক্কো-তে যারা কয়েক পুরুষ কাটিয়েছে সেই ফরাসীরা যেভাবে কথা বলে সেই রকম কতকটা। আশ্চর্যের বিষয়, এই গলার আওয়াজ আর এই কথার টান কেমন যেন আমার চেনা বলেই মনে হ'ল। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

কয়েক পা হুকুমমত এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ হেসে উঠে ফিরে দাঁড়ালাম। খবরদার হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বন্দুক আর একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

রিভলভার যার হাতে, তালগাছের মত লম্বা রোগা পাকানো বুড়োটে চেহারার সে লোকটিকে কখনো দেখিনি, কিন্তু দোনালা বন্দুক আমার পিঠে

ঠেকিয়ে যে হুকুম করেছিল শুধু গলা শুনেই তার পরিচয় ঠিকই অনুমান করেছিলাম, দেখলাম—সে তোমাদের এই সুস্তেল।

গৌর হঠাৎ একটা হেঁচকিই যেন তুলল মনে হ'ল।

ঘনাদা কথা থামিয়ে সন্দিগ্ধভাবে তার দিকে চাইতেই আমরা বলে উঠলাম—জল খেয়ে নে না একটু।

জল খাব কি!—গৌরই খেঁকিয়ে উঠল আমাদের—ঘনাদার দিকে দু' দুটো বন্দুক ওঁচানো না? তা বন্দুক আর রিভলভার তারা ছুড়ল তো?

না।—ঘনাদার মুখে রহস্যময় হাসি।

গুলি ছিল না বুঝি? না, খেলার বন্দুক?—শিশিরের বোকার মত প্রশ্ন।

খেলার বন্দুক নয়, গুলিও ছিল। ঘনাদার মুখ আবার গম্ভীর হ'ল।

তবে?—আমরা সবাই বেকুব।

ঘনাদা আবার হাসলেন,—গুলি ছুড়বে কি করে? সেই কথাই হাসতে হাসতে তাদের বললাম। বললাম—কই ছোড়ো গুলি! দেখি। একটু চুপ করে থেকে তাদের হতভম্ব মুখগুলো একটু উপভোগ করে আবার বললাম,—ভড়কিতে আর লাভ কি! সারা দুনিয়া ঢুঁড়ে এই অখদ্দে দ্বীপে আমায় গুলি করে মারবার জন্যে হানা যে দাওনি তা বুঝেছি। এখন মতলবটা কি খোলাখুলি-ই বলো।

খোলাখুলি-ই বলছি।—বুড়োটে লম্বা লোকটিই বজ্রগম্ভীর স্বরে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে এবার কথা বললেন,—আমাদের সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে।

কোথায়? কেন?

জানতে পাবেন না।—বুড়োর মুখ নয় যেন লোহার মুখোশ।

তাহলে কি করে যাই বলুন। ভাঙা ইংরিজির বদলে যদি নিজের ভাষায় কথা বলতেন তবু আপনার জাতটা দেশটা কি বুঝতে পারতাম। সুস্তেলের

তো ওসব বালাই নেই। টিউনিশিয়ায় জন্ম, জার্মানীতে শিক্ষা। যুদ্ধের পর রুশেরা কিছুদিন আটকে রেখেছিল বলত। তারপর ইংলণ্ডের হয়ে অজানা জায়গার মানচিত্র আঁকার ছুতোয় আফ্রিকায় আর বলিভিয়ায় ইকোয়েডরে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে হঠাৎ একদিন নিরুদ্দেশ বলে সবাই জানে। আপনাদের মত দুই অজানা আঘাটার মানুষের সঙ্গে কিছু না জেনে যেতে কি মন চায়।

একটি বন্দুক আর একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠল

এত কথা যে সুযোগের জন্যে বলছিলাম তা এবার মিলে গেল। সুস্তেল আমার টিটকিরিতে এতক্ষণ রাগে ফুলছিল। আমার কথা শেষ হতেই হুংকার দিয়ে উঠল,—তবু তোকে যেতেই হবে শুঁটকে বাঁদর। ভালোয় ভালোয় না যাস তোর মত পুঁচকে ফড়িংকে দু' আঙুলে টিপে নিয়ে যাবো!

তা চেহারার দিক দিয়ে সুস্তেল সে তম্বি করতে পারে। সুস্তেলকে তো দেখেছ? মাংসের একটা পাহাড়, কিং কং তার কাছে কোন ছার!

কিন্তু আমরা যে রোগা চিম্‌সে দেখলাম!—এমন একটা সুবিধে ছাড়তে না পেরে শিবু ফস্‌ করে বলে ফেললে।

সে তাহলে ভুগে ভুগে হয়েছে। তিন মাইল সমুদ্রের তলায় তিন দুকুনে ছ'হপ্তা ডুবে থাকা তো চারটিখানি কথা নয়। সেই থেকেই ওর অসুখ!—অম্লান বদনে শিবুর খোঁচা এবার অগ্রাহ্য করে আমাদের সত্যিকার হাঁ করে দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—তখন সে একটা দৈত্যবিশেষ। কিন্তু গর্জনের সঙ্গে আচমকা আমার একটি হাইকিক্-এ হাতের বন্দুকটা ছিটকে পড়তেই প্রথমটা একটু ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর মনে হ'ল বুনো ক্ষ্যাপা একটা হাতীই ছুটে আসছে আমার দিকে। ডিগবাজি খেয়ে হাত পাঁচেক দূরে ছিট্‌কে পড়েও তার রোখ কি যায়! গা ঝেড়ে ঝুড়ে উঠে, আগুনের ভাঁটার মত দু'চোখ দিয়ে আমায় যেন ভস্ম করতে এবার সন্তর্পণে দু' হাত বাড়িয়ে এগুতে লাগল। ধোবি-পাটে তাকে রাম-পট্‌কান দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছি এমন সময় ঘাড়ে পিঁপড়ের কামড়ের মত কি একটা জ্বালা পেয়ে ফিরে দেখি সেই পাকানো লম্বা বুড়ো শয়তানের মত আমার পিছনে হাতে কি একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তারপরে আর জ্ঞান নেই।

জ্ঞান যখন হ'ল তখন প্রথমটা স্বপ্ন দেখছি কিনা বুঝতে পারলাম না। এ কোথায় এলাম! ছোট্ট একটা জানলা-দরজাহীন কোটর বললেই হয়। ছাদটা এত নিচু যে বিছানার ওপর উঠে বসলেই যেন মাথায় ঠেকে যাবে। নারবরো দ্বীপ বিষুবরেখার ওপরে বলে সেখানে ছিল বেশ গরম আর এখানে দিব্যি ঠাণ্ডা। তাছাড়া বাতাসেও কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ। স্থির হয়ে ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছি এমন সময় খুট্ করে একটা আওয়াজ হয়ে সামনের দেওয়ালেরই খানিকটা যেন সরে গেল। একগাল হাসি নিয়ে পাহাড়ের মত শরীরটা কোনরকমে সেই গা-দরজার ফাঁক দিয়ে গলিয়ে সুস্তেল আমার বিছানারই এক ধারে এসে বসে পড়ে বলল,—যাক্, ঘুম তাহলে ভাঙল এতদিনে!

এতদিনে! মনে যা হল মুখে তা প্রকাশ করলাম না। বরং তাচ্ছিল্যের

সুরে একটু হেসে বললাম,—ভাঙল নয়, তোমরা ভাঙালে বলো! তা, কতদিন ওষুধপত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে?

তা মন্দ কি! প্যাসিফিক্-এ শুয়েছ আর অ্যাটলান্টিকে জাগলে। এখন আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে চলেছি।

হুঁ—একটু চুপ করে থেকে বললাম,—কিন্তু এ নিউক্লিয়ার সাবমেরিনটি কোথায় পেলে? 'অ্যাটমিক স্যব' তো শুধু মার্কিন মুলুকেরই আছে জানতাম।

'অ্যাটমিক স্যব!'—সুস্তেল সত্যিই চমকে উঠল,—কে বললে তোমায়!

ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে জেনেছি বোধহয়, যেমন সাত সমুদ্দুর খুঁজে আমায় কি জন্যে চুরি করে এনেছ তাও জানতে পেরেছি।

সুস্তেল প্রথম অবাক হওয়ার ধাক্কাটা খানিকটা সামলে বললে,—কি জন্যে এনেছি বলো দেখি?

—যে জন্যে এনেছ অ্যাটলান্টিকের তলা দিয়ে লুকিয়ে যাবার সে একটি মাত্র রাস্তার খোঁজ জিজ্ঞাসা করলে তো আমি এমনিই বলে দিতে পারতাম। তার জন্যে ছুঁচ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে চুরি করে আনবার দরকার ছিল না।

দরকার ছিল।—বলে সুস্তেল একটু হাসল।—আন্দাজ তুমি অনেকটা করেছ, সবটা পারনি। আতলান্তিকের তলার রিফ্‌ট্ ভ্যালির খাদের খবর তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না এটা ঠিক, কিন্তু সে খাদ ছকে দেওয়ার চেয়ে বড় কাজ তোমায় দিয়ে করাতে হবে।

ঘনাদা থামলেন। শিবুর কাশিটা মাঝে মাঝে এমন বেয়াড়া হয়ে ওঠে!

ফাঁক পেয়ে আর ঘনাদার মেজাজ পাছে বিগড়ে যায় এই ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—রিফ্‌ট্ ভ্যালিটা কি ব্যাপার ঘনাদা?

ঘনাদা খুশী হয়ে বললেন,—পৃথিবীর ওপরকার নয় অ্যাটলান্টিক সমুদ্রের তলার এ একটা আঁকাবাঁকা দুই পাহাড়ের মাঝখানকার লম্বা গিরিখাত, আইসল্যাণ্ডের তলা থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ আমেরিকার মাথা ছাড়িয়ে চলে

গেছে। এক ধারে মিড্‌অ্যাটলান্টিক রিজ্‌ আর এক ধারে রিফ্‌ট্‌ পাহাড়। এ রাস্তায় কোন সাবমেরিন চুপিসারে গেলে আমেরিকা কি ইউরোপ হদিসও পাবে না। সুস্তেলের কথায় জানলাম শুধু এই ডোবা গিরিখাত চেনানো নয়, অ্যাটলান্টিকের ক'টি ডুবো পাহাড়ের হদিসও আমায় দিয়ে তারা পেতে চায়। ডাঙার পাহাড়-পর্বতের তুলনায় এ সব ডুবো পাহাড় যে পেট্রোল থেকে শুরু করে দামী সব ধাতুর কুবেরের ভাণ্ডার এ খবর তারা জানে।

সমস্ত কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—আমায় যদি এতই দরকার তাহলে এ সাবমেরিনটা কাদের আমায় বলা উচিত নয় কি ?

অস্বস্তিভরে এদিক ওদিক চেয়ে সুস্তেল যেন একটু ভয়ে ভয়েই বললে, —বলতে মানা আছে।

মানা আছে!—তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে তীব্রস্বরে বললাম,—তাহলে দুনিয়ার ওয়াকিব মহলে যা কানাঘুষা চলেছে তা মিথ্যা নয়! আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড়া আর একটি গোপন তৃতীয় শক্তি কে বা কারা সত্যিই গড়ে তুলছে! আমেরিকা কি রাশিয়া যার যে ভুল বা দোষই থাক তারা মানুষের সত্যি কল্যাণ চায়, কিন্তু এই তৃতীয় শক্তির সে সব কোন দুর্বলতা নেই। আর যা-ই হোক, তোমার গায়ে ফরাসী রক্ত তো কিছু আছে, কি বলে শুধু পয়সার লোভে তুমি এদের কাছে নিজেকে বেচে দিয়েছ? নিজের দেশ বলে কিছু না মানো, মানুষ জাতের ওপরও কি তোমার মমতা নেই ?

সুস্তেল কিরকম যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। দু'বার ঢোঁক গিলে বললে, —দেখো দাস, আমার চেহারাটা প্রকাণ্ড হলেও ভেতরে ভেতরে সত্যি আমি দুর্বল। মনের জোর এত কম যে অন্যায় বুঝেও হঠাৎ প্রলোভনের কাছে হার মেনে বসি। বিশ্বাস করো যা আমি করেছি তার জন্যে আমার আফসোসের সীমা নেই। আমি পুরস্কারের লোভে তোমার খবর দিয়ে ওভাবে ধরবার ব্যবস্থা না করলে ওরা তোমার খোঁজও পেত না। কিন্তু এখন উপায় কি ?

সুস্তেলের কথাগুলো যে আন্তরিক তা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। তাকে এ কথার উত্তরে যা বলতে যাচ্ছিলাম তা কিন্তু আর বলা হ'ল না। সেই শয়তানের মত বুড়ো তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। কামরার ভেতর ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমায় একবার লক্ষ্য করে সে ভাঙা ইংরিজীতে সুস্তেলকে-ই বললে,—যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, এই দিচ্ছি!—বুড়ো হঠাৎ এসে পড়ায় সুস্তেল একটু যেন ভড়কে গেছে।

আচ্ছা, বুঝিয়ে কমিটিরুমে এসো। এখানে বেয়াড়াপনার শাস্তি যে কি তাও জানাতে ভুলো না।—বলে আমায় একটু সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে বুড়ো চলে গেল।

বুড়ো যেতেই আগ্রহভরে বললাম,—উপায় কি তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে?

সুস্তেল সভয়ে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চাপা গলায় বললে,—সাবধান! বেফাঁস আর কিছু বোলো না। এ ঘরে লুকানো মাইক আছে। তোমার ঘুমের সময় বন্ধ ছিল, এখুনি চালু হবে।

তার কথা শেষ হতে না হতে প্রায় অস্পষ্ট খুট্ করে একটা আওয়াজে বুঝলাম মাইক সজাগ।

কি এখন করা যায়! সুস্তেলকে গোটাকতক কথা এখুনি না বললে নয়।

তাকে চোখের ইশারা করে ধীরে ধীরে বললাম—তিন, একশ বাইশ, সাতাত্তর।

সে খানিক হতভম্ব হয়ে থেকে হঠাৎ উৎসাহভরে বললে,—ছয়!

বললাম,—তেইশ, চারশ পাঁচ, এগারো।

সুস্তেল তৎক্ষণাৎ উঠে ওই কামরারই একটি টেবিলের ওপর থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এল।

ব্যাপারটা কি হ'ল?—আমরা হাঁ করে ঘনাদার দিকে তাকালাম।

কি আর, সাংকেতিক কথা !—ঘনাদা একটু হাসলেন।

সাংকেতিক কথা তো বুঝলাম !—গৌর বললে,—কিন্তু ও তো শব্দ নয়, সংখ্যা। আর আপনি বলতেই সুস্তেল বুঝল কি করে ?

লোগোগ্র্যাফি জানলেই বুঝবে !—ঘনাদা অনুকম্পাভরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—লোগোগ্র্যাফিতে দু' হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে মোটামুটি সব কিছুই বলা যায়। সকলের অবশ্য অত মুখস্থ থাকে না। সঙ্গে লোগোগ্র্যাফির আলাদা অভিধান রাখতে হয়।

এর পরে আর ট্যাঁ ফোঁ করবার কিছু নেই, তবু চোখ কপালে তুলে বললাম,—আপনার বুঝি সব মুখস্থ ?

ঘনাদার মুখে স্বর্গীয় হাসি দেখা দিতেই শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—ওই সব হিজিবিজি অঙ্ক যে বলাবলি করলেন তার মানে কি ?

মানে ?—ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন,—মানে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি লোগোগ্র্যাফি জানো ? সুস্তেল তাতে জানালে, হাঁ। তখন তাকে খাতা পেন্সিল আনতে বললাম।

একটু থেমে আমাদের মুখের চেহারাগুলো দেখে নিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—খাতা পেন্সিল আনবার পর কাগজে লিখে সব কথাবার্তা সেরে ফেললাম। চুক্তি হয়ে গেল যে দুশমনদের চোখে ধুলো দেবার ফন্দিতে সুস্তেল আমার সহায় হবে গোপনে। কিন্তু সুস্তেলের সব সাধু সংকল্প শেষ পর্যন্ত তার মনের দুর্বলতায় ভণ্ডুল হয়ে গেল। তার এবং সাবমেরিনের সকলের প্রাণ বাঁচানোর কৃতজ্ঞতাটুকু পর্যন্ত সে দেখাল না। লোগোগ্র্যাফিতে তার কাছে জেনে নিয়েছিলাম যে নারবরো দ্বীপ থেকে আমায় অজ্ঞান করে আনবার সময় নিমারাকে সঙ্গে না নিলেও আমার ক'টি দরকারী বাক্স ব্যাগ সাবমেরিনে তুলে নিয়েছিল। আইসল্যাণ্ড ছাড়িয়ে রিফ্ট্ ভ্যালির খাদে সাবমেরিন ঢোকবার পর সেই ব্যাগ আর বাক্স না থাকলে এ গল্প আর এখানে বসে করতে হত না। সেইখানেই সাবমেরিনটির কবর হয়ে যেত !

কেন? অ্যাটমিক সাবমেরিন না?—মুখ থেকে বেরিয়ে গেল আপনা থেকে।

হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাবমেরিনও বেগড়ায়। একসঙ্গে তখন ওপরে ভাসিয়ে তোলার আর হাওয়া শোধনের কল গেছে খারাপ হয়ে। সে সব যন্ত্র মেরামত করতে যতক্ষণ লাগবে তার আগেই কার্বন-ডায়ক্সাইডের গ্যাসে আমাদের কারুর আর জ্ঞান থাকবে না! সুস্তেলের মুখ তো ছাইএর মত ফ্যাকাশে। সেই শয়তান বুড়ো পর্যন্ত কেমন একটু দিশাহারা।

আমার ব্যাগ থেকে ওই শিশি তখন বার করলাম।

ওই শিশি—এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলাম! ওই শিশিতে সাবমেরিন ভাসল?

সাবমেরিন ভাসবে কেন?—ঘনাদা অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, হাওয়ার সমস্যা মিটল।

ওই শিশিতে?—আমরা আবার হাঁ।

—হ্যাঁ ওই শিশিতে। ও শিশিতে কি ছিল জানো? ক্লোরেলা নামে একরকম আণুবীক্ষণিক ফাঙ্গাস্—যাকে ছত্রাক বা ছাতা বলে। সিকি আউন্স জলে প্রায় চার কোটি ক্লোরেলা থাকে। কার্বন-ডায়ক্সাইড থেকে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ছেঁকে বার করতে তার জুড়ি নেই। শিশি থেকে নানান পাত্রে সেই ক্লোরেলার ফোঁটা জলে ফেলে সমস্ত সাবমেরিনের নানা জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করলাম।

দেখতে দেখতে বদ্ধ হাওয়ার সব বিষ কেটে গেল।

সময়মত যন্ত্রপাতি মেরামত হ'ল। তারপর প্রায় একমাস ধরে সমুদ্রের তলায় সমস্ত রিফ্ট্ গিরিখাদ আর মরক্কোর পশ্চিমের মাদিয়া অ্যাবিস্যাল প্লেন থেকে প্লেটো আর অ্যাটলান্টিস্ সি-মাউন্ট হয়ে সার্গাসো সমুদ্রের উত্তরে সোহ্ম্ অ্যাবিস্যাল প্লে-ন পেরিয়ে বার্মুদা পেডেস্টাল পর্যন্ত আতলান্তিকের

বিশাল অতল রাজ্যের সন্ধান নিয়ে একদিন নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের এক নির্জন তীরে গিয়ে উঠলাম।

সেই শয়তান বুড়োর মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। একটি নির্জন খাঁড়িতে ঢুকে সাবমেরিন থামবার পর বুড়ো এসে হঠাৎ বাইরে তার সঙ্গে একটু ঘুরে আসার অনুরোধ জানালে।

হেসে বললাম,—যা কুয়াশার দেশ, এখানে টহল দেবার শখ আমার নেই।

তবু একবার বেড়িয়েই আসি চলো না। এখানকার সীল মাছ একটা শিকারও করা যেতে পারে।

প্রতিবাদ নিষ্ফল জেনে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরুলাম। দেখলাম শুধু বুড়ো নয় সুস্তেলও সঙ্গে চলেছে। শিকারের লোভ দেখালেও বন্দুক শুধু বুড়োরই হাতে।

তীর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই বুড়ো সোজাসুজি আসল কথা পাড়লে—লুকোনো ম্যাপটা এবার দাও দাস।

উঁচিয়ে ধরা বন্দুকটা অগ্রাহ্য করেই অবাক হয়ে বললাম,—অ্যাটল্যান্টিকের তলার ম্যাপ! সে তো সাবমেরিনেই আছে।

না,—বুড়োর গলার স্বরে যেন বাজ ডাকল—সে ম্যাপ ফাঁকি। সুস্তেল সব আমার কাছে স্বীকার করেছে। আসল ম্যাপ তুমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছ! দাও।

সুস্তেলের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালাম। সে একেবারে অমানুষ নয়। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে থতমত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বুড়োর দিকে ফিরে বললাম,—যদি না দিই।

তাহলেও ও ম্যাপ আমি পাব, শুধু এই নির্জন তীরে তোমায় শেষ নিশ্বাস নিতে হবে। কেউ জানতেও পারবে না কিছু।

বুড়ো বন্দুকের সেফ্‌টিক্যাচ্‌টা সরালো।

সুস্তেল হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে,—দাঁড়ান, ওই ছুঁচোর জন্যে গুলি খরচ করবার দরকার নেই। একবার আমায় বেকায়দায় কাবু করেছে, তার শোধ আমি নিজে হাতে নিতে চাই।

শোধ সে সত্যিই নিলে। দু'বার আমার প্যাঁচে মাটি নিয়ে তিন-বারের বার আমার পিঠের ওপর ঘটোৎকচের মত চেপে বসল ঘাড়টা লোহার মত হাতে আমার পেছনে টেনে ধরে। প্রায় মটকে যায় আর কি!

বুড়ো এবার এগিয়ে এসে সব খুঁজে শেষ পর্যন্ত জুতোর সুকতলার নিচে থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার করে নিয়ে বললে,—ছেড়ে দাও কালা ভূতটাকে।

ছেড়ে-ই তারা রেখে গেল। তারপর একা সেই জনমানবহীন খাঁড়ির পাড়ে।

দিন তিনেক উইলো-গ্রাউসের বাসা খুঁজে খুঁজে শুধু ডিম খেয়ে কাটাবার পর, এক সীল-শিকারী দলের মোটর বোট সেখানে না এলে আর ফিরতে হ'ত না।

ঘনাদা থামলেন। শিশিরের মুখে-ই আমাদের সকলের প্রশ্ন সবিস্ময়ে বার হ'ল।

—বলেন কি ঘনাদা! আপনি সুস্তেলের কাছে হারলেন, আবার যে ম্যাপের জন্যে এত তাও ওরা কেড়ে নিলে!

ঘনাদা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সুস্তেলের কাছে না হারলে ওই জাল ম্যাপ ওরা বিশ্বাস করে কেড়ে নিয়ে যায়! সুস্তেলকে ওইটুকুর জন্যেই ক্ষমা করেছি।

অভিভূত হয়ে ঘনাদাকে শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে যাবার সময় শিশির মেঝে থেকে কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল মনে হ'ল।

নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি একটা কুড়িয়ে নিলি তখন?

শিশির ছেঁড়া পাকানো কাগজটা আমাদের সামনে খুলে ধরে বললে,—আমাদের সব ফন্দি যাতে ফাঁস সেই আসল জিনিস।

দেখি ক'জনে মিলে সুস্তেলের নামে যে চিঠি বানিয়েছিলাম তারই হাতে লেখা খসড়াটা। ঘনাদা কখন কোথায় যে কুড়িয়ে নিয়েছেন জানতেও পারিনি।

—